রস রহস্য আতঙ্ক

সায়ন্তনী পুতুণ্ড

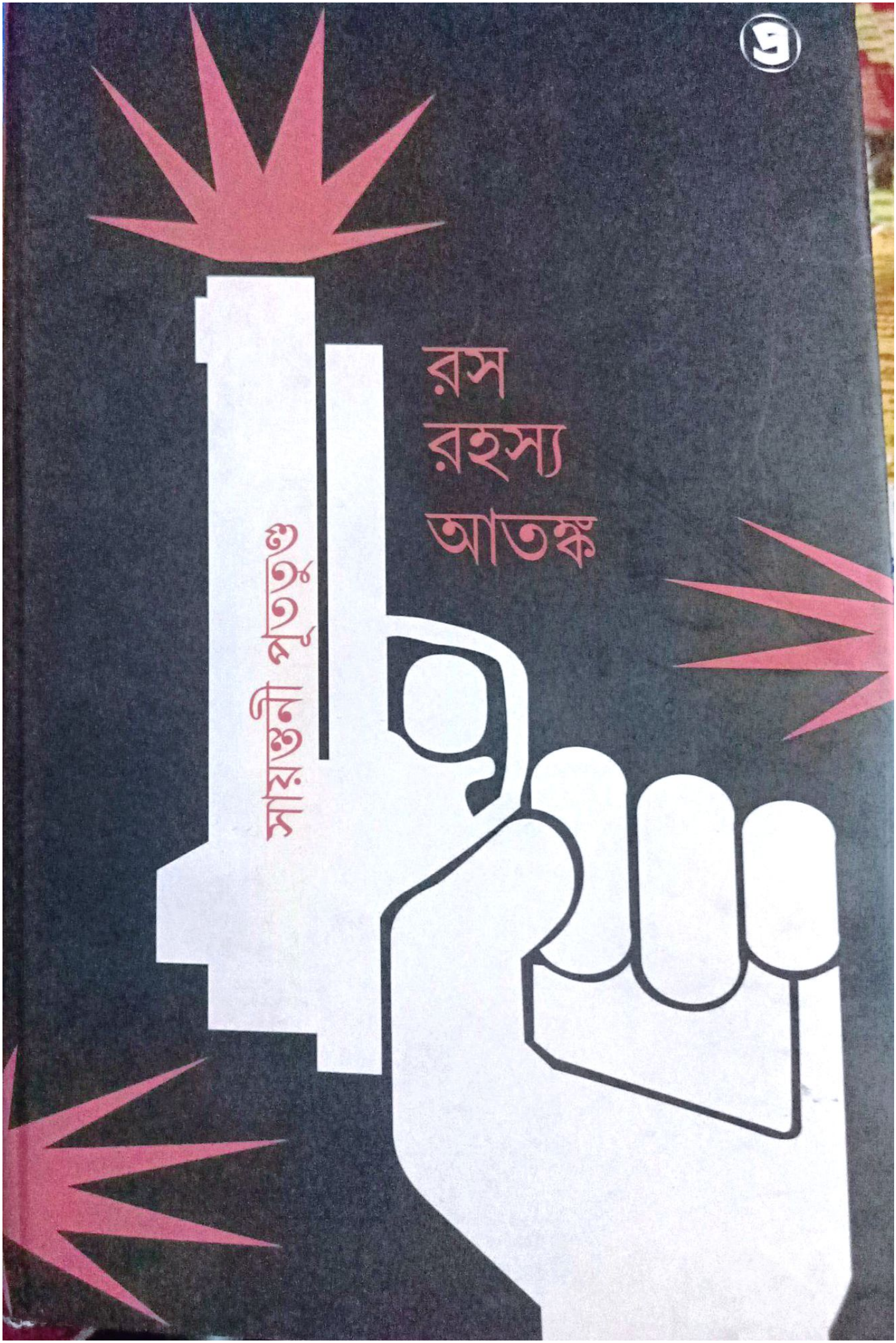

ব ড়ো গ ল্প

ছদ্মবেশী ফুল ১৭১

ছো টো গ ল্প

ত্রাহি মধুসূদন ১৯৬
বাকিটা ঈশ্বর ২০৫
গুংগার গাছ ২১৪
হ্যালুসিনেশন ২২৪

ছদ্মবেশী ফুল

১

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ল্যাবের অ্যালার্ম বেজে উঠল!

এতক্ষণ ল্যাবরেটরির ভেতরে কোনও আওয়াজ ছিল না। অন্যদিনও বিশেষ থাকে না। শুধু মাঝেমধ্যে টেস্টটিউবের টুংটাং আর বিকারে জল গরম করার খলবল শব্দ অস্ফুটভাবে শোনা যায়। ভেতরের মানুষগুলো ক্বচিৎ কদাচিৎ কথা বলে। তাদের কথা বলার সময় কোথায়? সবাই সাদা অ্যাপ্রন পরে কাজ করতেই ব্যস্ত!

আজ সকালেও এমন শান্ত পরিবেশ ছিল। ল্যাবের মুখ্য বিজ্ঞানী ড. হিঙ্গোরানি একটি গোপন আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত আছেন!' ঘরে সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ। একমাত্র ড. হিঙ্গোরানিই প্রাইভেট পাসওয়ার্ড দিয়ে ও ঘর খুলতে পারেন। ব্যাপারটার সঙ্গে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই এত কড়াকড়ি! এত গোপনীয়তা! নতুন আবিষ্কারটা নিয়ে একাই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি আমাকেও সাহায্য করতে দেননি।

আজও প্রায় সকাল আটটায় এসে সোজা ঢুকে গেছেন নিজের ল্যাবে। আর তার প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট, ড. অনুপম সেন, তথা আমি আমার নিজস্ব কেবিনে বসে কয়েকটা প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করছি।

এমন সময়ই অ্যালার্মের পরিত্রাহি চিৎকার! ক্যাঁও... ক্যাঁও করে সমস্ত ল্যাবরেটরিকে চকিত করে তারস্বরে বেজে উঠল!

উপস্থিত সবাই চমকে ওঠে! অ্যালার্ম বাজছে কেন? আওয়াজটা সবচেয়ে বেশি জোরে আসছে ড. হিঙ্গোরানির ল্যাব থেকে!

বুকের ভেতরটা প্রায় লাফিয়ে উঠল! কী হল? ড. হিঙ্গোরানির কিছু হল না তো! নতুন আবিষ্কারটা ঠিক আছে...?

তখন কিছু বলার বা ভাবার মতো অবস্থা ছিল না। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে ড. হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাবের দিকে! আমার সহযোগী গৌতম উলটোদিক থেকে পড়িমরি করে ছুটে এল। বেচারা অ্যালার্মের শব্দে ঘাবড়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কোনওমতে বলে— 'স্যার...! কী হল? অ্যালার্ম বাজছে...!'

কোনওমতে উত্তর দিই— 'জানি না'।

— 'ড. হিঙ্গোরানি...' সে ভয়ার্তভাবে বলে— 'ওনার ঘরেই তো অ্যালার্ম বাজছে মনে হয়...'

প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতেই জবাব দিলাম— 'হ্যাঁ, চলো শিগগিরি... দেখি কী হল...'

অন্যান্য দিন ডক্টরের প্রাইভেট ল্যাবের লোহার দরজা পাসওয়ার্ড সিস্টেমে বন্ধ থাকে! আজও তেমনই থাকার কথা। কিন্তু দরজায় হাত রেখেই এক নতুন ট্রেনি গবেষকের ভুরু কুঁচকে গেল।

— 'ড. সেন...' সে একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে। তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়— 'দরজাটা খোলা!'

দরজা খোলা! ভাবাই যায় না! এই দরজা দিনে দুবারই খোলে। যখন ড. হিঙ্গোরানি ল্যাবে ঢোকেন তখন একবার, আর যখন বেরিয়ে যান স্রেফ তখন! এর মধ্যে ল্যাবের দরজা কোনওমতেই খোলা সম্ভব নয়! এ দরজা শুধু পাসওয়ার্ডে খোলে।

আর পাসওয়ার্ড ডক্টর নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না!

কিছু গোলমাল হয়েছে... কী ঘটেছে জানি না... কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ভীষণ অমঙ্গলের ছায়া সবার মুখেই ছাপ ফেলে সরে সরে যাচ্ছিল।

— 'ড. সেন... স্যার, আপনি দেখুন'। গৌতম ফিশফিশ করে বলে— 'আমি সাহস পাচ্ছি না!'

সাহস তো আমিও পাচ্ছিলাম না! দরজাটা খোলা দেখেই ভয়ে ঘামছি। ভেতরে রয়েছেন ডক্টর আর তার গোপনীয় ও অমূল্য আবিষ্কার! ঘরে ঢুকে কী দেখব সেই আশঙ্কায় কাঁটা হয়েছিলাম। তবু... কাউকে তো এগোতেই হবে...!

ভেতরে তখনও ফুলদমে এসি চলছে! চিলড এসির স্পর্শে শরীর ছ্যাঁৎ করে উঠল। চতুর্দিকে সারিসারি সাজানো কেমিক্যালের শিশি। কাচের বাক্সে রাখা স্পেসিমেন। কোনওটা কেমিক্যালে ডোবানো, কোনওটা আবার এমনিই রাখা!

— 'ড. হিঙ্গোরানি... ড-ক্ট-র...'।

কোনও সাড়া নেই! ল্যাবের ভেতরের টিউবটা শুধু দপদপ করে জ্বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুরোপুরি জ্বলছে না। থেকে থেকে জ্বলছে নিভছে।

আমরা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম ভেতরের দিকে। ডানদিকে আর বাঁদিকে বইয়ের সেলফ। বইগুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে! যেন ওগুলোর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে!

অথচ এমন হওয়ার কথাই নয়। ডক্টর ভীষণ গোছালো প্রকৃতির। বিশেষ করে বইয়ের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ভীষন খুঁতখুঁতে। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একটু অযত্ন হলেই আমায় পাঁচ কথা শুনিয়ে ছাড়েন। কোনও বইয়ের পাতা সামান্য ছেঁড়া দেখলেই সারা অফিস মাথায় তোলেন।

সেই লোকের ঘরে বইয়ের এই অবস্থা!

— 'ডক্টর... ডক্টর হিঙ্গোরানি... স্যা-র...!'

— 'অ-নু-প-ম!'

এবার উত্তর এল। কিন্তু একদম অস্বাভাবিক উত্তর! ডক্টরের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। আর-একটু এগিয়ে যেতেই যা চোখে পড়ল তা দেখে আঁতকে উঠি...

ডক্টর প্রায় বেহুঁশের মতো পড়ে আছেন মাটিতে। মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে।...

— 'স্যার... স্যার...'।

ব্যাকুল হয়ে তাকে ধরে কোনওমতে তোলার চেষ্টা করি। ডক্টর নির্জীবের মতো আমার বুকের ওপর এলিয়ে পড়লেন। প্রায় সর্বহারার মতো আঙুল তুলে সামনের কাচের বাক্সটা নির্দেশ করলেন— 'ওই দ্যা-খো'!

কী সর্বনাশ! বাক্সটা ফাঁকা! সেখানে ক্যামোফ্লেজিয়া নেই!

২

— 'ক্যামোফ্লেজিয়া মিসিং? হাও ক্যান ইটস পসিবল?'

মন্ত্রীর ভুরু দুটো ঠিক শুঁয়োপোকার মতো দেখাচ্ছিল! মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট।

— 'আমি জানি না'। ক্লান্ত স্বরে বলছিলেন ড. হিঙ্গোরানি। মাথায় তিনটে স্টিচ নিয়ে তাকে আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ব্যান্ডেজ করা কপালে হাত রেখে চুপ করে বসেছিলেন।

— 'কীভাবে এরকম হয়? এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার!' রেগে গিয়ে বললেন মন্ত্রী— 'আপনাদের সুরক্ষাপ্রণালীই কাঁচা! এবার আমি ওপরমহলকে কী জবাব দেব?'

অনেক যুক্তি দিয়েও কিছুতেই তাকে বোঝানো গেল না যে ক্যামোফ্লেজিয়াকে যথেষ্ট কড়া নজরেই রাখা হয়েছিল। ড. হিঙ্গোরানির সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় নিশ্ছিদ্রই বলা যায়। তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতী কোথা দিয়ে ঢুকল তা বুঝতে পারছি না কেউই!

— 'এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার!' তিনি আরও চটে গিয়ে বলেন— 'ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কয়েক কোটি টাকা ঢেলেছে এটার পেছনে। ড. হিঙ্গোরানি, আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি'।

— 'হ্যাং ইওর কয়েক কোটি টাকা!' এবার ডক্টরের ধৈর্যও জবাব দিয়েছে— 'আপনি কয়েক কোটি টাকা দেখছেন? কয়েক কোটি মানুষের কথা ভাবছেন না? ওটা কোনও সাধারণ জিনিস নয়। দ্যাট ইজ আ মার্ডার ওয়েপন। আ ভেরি ডেঞ্জারাস ব্লাডি মার্ডার ওয়েপন... এত কোটির দেশে সেটা একবার বাইরে পড়লে কেউ বাঁচবে না। নট আ সিঙ্গল ওয়ান... বুঝেছেন?'

মন্ত্রী কটমট করে ডক্টরের দিকে তাকাচ্ছেন— 'জানি। তাই তদন্ত দরকার। এভাবে ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিতে পারি না আমরা। এ চোর জানে যে জিনিসটা কোথায় রাখা ছিল। আপনার পাসওয়ার্ড ভেঙে সে ঘরে ঢুকেছে, অথচ এখানকার কোনও স্টাফ, সিকিউরিটি গার্ড কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেননি'।

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

— 'তাহলে সে কোনওভাবে বাইরের কেউ নয়। ঘরেরই লোক। এই ল্যাবেরই কোনও কর্মী'। মন্ত্রীজি আমাদের সবার দিকে রক্তচক্ষু করে তাকালেন— 'আপনারই কোনও লোক!'

একেই অমন মারাত্মক জিনিসটা চুরি যাওয়ার আতঙ্ক তো ছিলই। তার ওপর আবার নতুন আপদ জুটল! সন্দেহ!

ক্যামোফ্লেজিয়া জিনিসটা বারদুয়েক স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একটা সামান্য ঘাসফুলের মতো দেখতে জিনিসটাকে। কেউ দেখলে ভাববেই না যে জিনিসটা অমন মারাত্মক!

ঘাসফুলের একটি প্রজাতির জেনেটিক কোড ব্রেক করে বিশেষভাবে ডিএনএ তৈরি করার পর ক্যামোফ্লেজিয়া জন্মেছে। মূল ফর্মুলাটা গুপ্ত। ড. বিবেক টোডি, ড. হিঙ্গোরানি ও ড. সুকুমার বসু ছাড়া আর কেউ জানে না। জিনিসটা তৈরি হওয়ার পর একঝলক দেখেছিলাম। সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা ফুল। ঘাসফুলই বলা যায়। কিন্তু তিন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন যে, যতই নিরীহ হোক না কেন, এই ফুল মারাত্মক। এই ফুলের গন্ধ এতটাই বিষাক্ত যে একটা ফুলই দশটা মানুষ মারার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যাকোনিটামের বিষাক্ত ডিএনএ-র সঙ্গে মিলিয়ে যেহেতু তৈরি তাই এর গন্ধে আকোনাইটের মতো মারাত্মক বিষ আছে! একবার নাকে গেলে রক্ষা নেই। কোমা অবধারিত! এবং পরে মৃত্যু।

ক্যামোফ্লেজিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক বৈশিষ্ট্য যে এটি রং পালটাতে পারে! এটা কী করে করলেন তিন বৈজ্ঞানিক তা জানা যায়নি। কিন্তু ক্যামোফ্লেজিয়ার ডেমোনস্ট্রেশনের সময়েই দেখেছি যে এই ফুলটা অদ্ভুতভাবে রং পালটায়!

প্রথমবার যখন দেখি তখনই প্রায় চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল! ভাবতেই পারিনি যে এমনও হতে পারে! ডেমোনস্ট্রেশনের আগেই কনফারেন্স হলে উপস্থিত ছয় দর্শককে গ্যাস মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে নাকে গন্ধ না যায়! সেই ছ-জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। বাকি পাঁচজন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির হোমরা-চোমরা।

দর্শকাসনে বসেই বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ড. হিঙ্গোরানি একটা গিনিপিগের বাক্সে ক্যামোফ্লেজিয়া রেখে দিলেন! এক মিনিটও লাগল না! গিনিপিগগুলো পটাপট মরে গেল!

শুধু এইটুকুই নয়, ডক্টর ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে তার পেছনে একের-পর-এক রঙের জিনিস রাখতে লাগলেন। কখনও ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো, কখনও নীল, কখনও লাল!

আমরা বোকার মতো হাঁ করে দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে রং পালটাচ্ছে ক্যামোফ্লেজিয়া! একদম মিশে যাচ্ছে পেছনের জিনিসটার সঙ্গে!

এ এক অদ্ভুত অস্ত্র। একরাশ যে-কোনো ফুল, গাছ বা অন্য কিছুর মধ্যে একটা

রেখে দিলে সেটাকে কেউ আলাদা করে চিনতেই পারবে না। রং পালটিয়ে সে মিশে যাবে পেছনের বস্তুটির সঙ্গে। এবং সেখান থেকেই বিষ মাখা সুগন্ধ দিয়ে যাবে এই অদৃশ্য ফুল। তার সামনে বসে থাকা হতভাগা জীবটি বুঝতেও পারবে না যে কখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছদ্মবেশী শমন! বোঝার আগেই শেষ!

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল ডক্টরকে। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম! ভেবেছিলাম, এইরকম ভয়ংকর অথচ নিরীহ চেহারার মারণাস্ত্র তৈরি করে কী সর্বনাশই না করলেন ডক্টর! কত নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবে এই সাধারণ চেহারার ছদ্মবেশী ফুল, ক্যামোফ্লেজে সিদ্ধহস্ত—ক্যামোফ্লেজিয়া!

কিন্তু ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার আগেই লোপাট হয়ে গেল ক্যামোফ্লেজিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই গোপনে চলল কড়া তদন্ত। আমাদের সবার বাড়ি তোলপাড় করে সার্চ করা হল। কিন্তু কারোর বিরুদ্ধেই কিছু পাওয়া গেল না।

তখন অন্য রাস্তা ধরল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিটি দূতাবাসে খোঁজ রাখল, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের ফলো করল। সেখানেও কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হল তারা। ক্যামোফ্লেজিয়া যে চুরি করেছে, সে সেটা অন্য কোনও দেশকে বিক্রি করার জন্য চুরি করেনি। হয়তো তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু কী?

৩

উদ্দেশ্যটা বুঝতে অবশ্য একসপ্তাহও সময় লাগল না!

প্রথমেই মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যাটাকে মারা গেলেন ড. বিবেক টোডি!

তখনও ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। হৃৎযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বয়েসও হয়েছিল। তার ওপর ডাক্তারদের বারবার বারণ করা সত্ত্বেও অ্যালকোহলের নেশাকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তাই তার মৃত্যুটা খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়। দুঃসংবাদটা শুনে আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বিস্মিত হইনি।

কিন্তু ড. সুকুমার বসুও যখন হঠাৎ একদিন তার বাড়িতেই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখন ব্যাপারটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ড. বসুকে নার্সিংহোমে ভরতি করা হলে ডাক্তাররা বলল যে তিনি কোমায় আছেন। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সঙ্গে ভয়ানক ভেন্ট্রিক্যুলার অ্যারিদমিয়াস!

এই সবগুলো লক্ষণ শুনেই বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করতে লাগল। এর সব ক-টাই অ্যাকোনিটামের লক্ষণ! মন বলতে লাগল, এ ঠিক সমাপতন নয়! এর পেছনে গুরুতর কোনও চক্রান্ত আছে। ক্যামোফ্লেজিয়ায় অ্যাকোনিটামের পার্সেন্টেজ যথেষ্ট!

প্রথম মৃত্যুটাকেও তখন আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না আমাদের। ড. বিবেক টোডি ও ড. বসু— দুজনেই এমন মারাত্মকভাবে হৃদযন্ত্রের অসুখে আক্রান্ত হলেন!

তাও মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে! কী করে হতে পারে? এ কি নিতান্তই কাকতালীয়? না অন্য কিছু? দুজনেই ক্যামোফ্লেজিয়ার আবিষ্কারে যুক্ত ছিলেন। এই দুজন আর ড. হিঙ্গোরানি— এই তিনজনই তার জন্মদাতা। মূল ফর্মুলাটা এরাই জানেন। তারপর আর কেউ যদি সামান্য কিছুও জেনে থাকে, সে আমি! প্রথম তিনজনকে সরিয়ে দিতে পারলে এই মারাত্মক অস্ত্রটি দ্বিতীয়বার আর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেক্ষেত্রে যে চুরি করেছে, তার কাছে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না ক্যামোফ্লেজিয়ার নমুনা! সমস্ত বৈদেশিক শক্তি, তার সঙ্গে ভারতও টাকার থলে নিয়ে তার পেছনে অসহায়ের মতো ছুটবে।

বেশ বুঝতে পারছি যে এ আমাদের মধ্যেই কারোর কীর্তি। কিন্তু কে? কে হতে পারে? এখানে প্রথম তিনজনের পরই আমার স্থান। আমি নই। তবে? গৌতম...?

কয়েকদিন গৌতমকে খুব চোখে চোখে রাখলাম। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। সে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। এবং যতদূর জানি এত বড়ো দুঃসাহসিক কাজ করার সাধ্যও তার নেই। সত্যি বলতে, এই অফিসের কারোর আদৌ আছে কিনা সন্দেহ!

তবু কেন জানি না কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। যাকেই দেখছি, মনে হচ্ছে, এই সে নয় তো!

থাকতে না পেরে একদিন ড. হিঙ্গোরানিকে কথাটা বলেই ফেললাম। মনে হচ্ছিল স্যারকে সতর্ক করাটা সত্যিই দরকার।

ড. হিঙ্গোরানির টেবিলের ওপর একটা ফুলের বোকে রাখা ছিল। সম্ভবত গোলাপ ফুলের। তিনি আমায় একটা গ্যাস মাস্ক এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'পরে নাও অনুপম, গোলাপের গন্ধে তো তোমার আবার মারাত্মক অ্যালার্জি হয়। এই মুহূর্তে তুমিই আমার ডানহাত। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মুশকিল।'

গোলাপের গন্ধে সত্যিই আমার ভয়াবহ অ্যালার্জি। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে গ্যাস মাস্ক পরে নিলাম।

— 'হ্যাঁ, বলো কী বলছিলে?'

নিজের থিয়োরি ও সন্দেহের কথা স্পষ্ট করেই বললাম। শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেমে থেকে বললেন— 'তোমার সন্দেহ সঠিক কিনা জানি না। ড. বসু এখনও কোমায়। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই অ্যাসফিক্সিয়া বা অক্সিজেন ডেফিশিয়েনসির লক্ষণ দেখা গেছে। তোমার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

— 'সেক্ষেত্রে স্যার, আপনার সাবধান হওয়া উচিত।'

তিনি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান— 'শুধু আমারই নয়, তোমারও সাবধানে থাকা উচিত অনুপম।'

— 'আমি!' অবাক হয়ে বলি— 'কিন্তু আমি তো খুব অল্পই জানি এ সম্বন্ধে!'

— 'সে তো তুমি আর আমি জানি।' ডক্টর শান্তভাবেই বললেন— 'কিন্তু যার মাথায়

একাই ওই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার দুর্বুদ্ধি ঘুরছে সে তো জানে না। তুমি আমার মেইন অ্যাসিস্ট্যান্ট। ডানহাত যাকে বলে। আমার পরে তোমারই তো সব জানার কথা। পুরোটা না জানলেও অল্পবিস্তর তো জানোই। তোমায় ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি কি সে নেবে?'

এই কথাটা আগে মাথায় আসেনি। ড. হিঙ্গোরানি বলার পর মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সত্যিই তো!

— 'এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না অনুপম।' তিনি সহজভাবেই বললেন— 'এটা স্রেফ একটা কো-ইনসিডেন্স, আই হোপ।'

আই হোপ-শব্দটার মধ্যে তেমন জোর পাওয়া গেল না!

উনি যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন, আমি কিন্তু তা পারলাম না।

ওনার বলা শেষ কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। সত্যিই তো! আমাকেও কি ছাড়বে ওই অজানা আততায়ী? ড. টোডি, ড. বসু ও ড. হিঙ্গোরানির পর তো আমিই একমাত্র মানুষ, যে ক্যামোফ্লেজিয়া সম্পর্কে সামান্য হলেও খবর রাখে। অন্তত ক্যামোফ্লেজিয়াটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি সেটা কীভাবে কাজ করে। তার সঙ্গে এও জানি যে জিনিসটার এফেক্ট মানব শরীরে কী হয়, সিম্পটমগুলো ও মিক্সড ভেনামের নামটাও জানি।

গাড়িতে যেতে যেতেই বারবার কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল। বাড়িতে পৌঁছেও দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে গেল না।

আমার বাড়িটা বেশ বাংলোবাড়ির মতো করে সাজিয়েছি। ছোট্ট সুন্দর লাল টালি বসানো দোতলা বাড়ি। লাল টালিগুলো আমারই পছন্দ করে কেনা। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মালির যত্নে বেশ ঝকঝকে চকচকে হয়ে উঠেছে। বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ে, নানান বিদেশি ফুলে, লতায়, মশে রঙিন হয়ে উঠেছে! ভেলভেটের মতো ঘাসের সবুজ রঙে পান্নার ঔজ্জ্বল্য! দু-দিকে দুটো ঝাউগাছ মালির যত্নে একদম নিখুঁত আকারে রাজার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রোজ বাড়িতে ঢোকার সময় এই বাগানটার দিকে তাকালেই মন ভালো হয়ে যায় আমার। কিন্তু আজ...

আজ ভয় হল!

কে বলতে পারে, এই বাগানেই কেউ একটা ক্যামোফ্লেজিয়া রেখে যায়নি! ডক্টর হিঙ্গোরানির কাছে এও শুনেছি যে এই স্পিসিসটা খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। মাত্র একসপ্তাহের মধ্যেই সে প্রায় একটা গোটা ব্যাটেলিয়ন তৈরি করে ফেলতে পারে। অসম্ভব শক্তিধর এই আবিষ্কার!

কোনওদিন এত খুঁটিয়ে বাগানটাকে দেখিনি। আজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। নাগ কেশরের ঝাড় রীতিমতো ফুলেফেঁপে উঠেছে। পাশে স্পাইনি অ্যাকান্থাস আর ফায়ারস্পাইক ফুটে রয়েছে। ইচ্ছে ছিল অ্যান্থোনিয়ামও রাখব গ্লাসহাউস করে।

কিন্তু ফুলগুলো বাঁচেনি।

আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি। তাই গোলাপের কোনও প্রজাতিকেও রাখিনি। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ফুলে, গোলাপি, হলুদে, লালে জমকালো হয়ে উঠেছে আমার বাগান।

আজ ফুলের সৌন্দর্য দেখার মানসিকতা ছিল না। আমার সন্ধানী চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজছিল রঙিন ফুলের মধ্যে একটা ছোট্ট বিশেষ ফুলকে। রঙের বিষয়ে সঠিকভাবে বলা মুশকিল। হয়তো সে পুরোপুরি বেগুনি হয়ে মিশে গেছে ডেজার্ট পিটুনিয়ার ভিড়ে। অথবা গোলাপি হয়ে আইসপ্ল্যান্টের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। কিচ্ছু বলা যায় না... কিচ্ছু বলা যায় না...! ক্যামোফ্লেজিয়ার পক্ষে সবই সম্ভব!

প্রায় গোরুখোঁজা খুঁজতে খুঁজতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ঘাসের ফাঁকে ছোটো ছোটো সাদা ফুল!

ঘাসফুল! না...

টের পেলাম হঠাৎ করেই বুকের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। এতগুলো ঘাসফুল কবে আমার বাগানে ফুটল? আগেই ফুটেছিল? না এখন...? আজকেই...?

— 'প্রতাপ... প্র-তা-প!'

নিজের কণ্ঠস্বরকেই আর তখন চিনতে পারছি না। গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তাই চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে নিজের কানেই নিজের গলা ভীষণ কর্কশ শোনাল!

আমার তারস্বরে চিৎকার শুনে প্রতাপ প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে আসে। আমায় এভাবে চ্যাঁচাতে ও আগে কখনও দেখেনি। রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েই সে ছুটে এসেছে।

— 'স্যার...' সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। এত ফুলের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তার স্যার কেন অমন আর্তনাদ করছেন তা বোধহয় বুঝে উঠতে পারেনি।

— 'এগুলো কী?' আমি তখন ঘামছি। কোনওমতে আঙুল তুলে ছোটো ছোটো সাদা ফুলগুলোকে দেখাই।

সে অবাক— 'ঘাসফুল স্যার!'

— 'ঘাসফুল!' কী করব ঠিক করতে না পেরে ওর ওপরই রেগে যাই— 'এ বাগানে ঘাসফুল কেন?'

— 'স্যার...' প্রতাপ থতমত খেয়ে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়েছি— 'এখনই কেটে ফ্যালো। এক্ষুনি... ইমিডিয়েটলি... এখানে আর একটাও ঘাসফুল দেখতে চাই না আমি।'

ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে মাথা নাড়ল।

— 'আর... হ্যাঁ... ওগুলো ছেঁটে ফেলার আগে মুখে মাস্ক পরে নেবে। নাকে যেন গন্ধ না যায়। বুঝেছ?'

আমি আর ওখানে দাঁড়াই না। মোরাম বিছানো পথ দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে

দেখি, প্রতাপ কিছুক্ষণের জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এককোণের স্টোররুম থেকে কাটারি নিয়ে এল। আমার কথা অবজ্ঞা করেনি। গামছা দিয়ে নাক-মুখ পেঁচিয়ে বেঁধেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। প্রতাপ কী ভাবল কে জানে। হয়তো ভাবল স্যারের মাথায় ছিট! যাই ভাবুক, ওই ফুলগুলো তো আর ওখানে থাকবে না!

ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ! সবসময় বন্ধ থাকলে যা হয় আর কী! সকালে চাউমিন খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তার সসের গন্ধ এখনও নাকে ঝাপটা মারছে।

ভীষণ বিরক্ত লাগল। আমার কাজের লোক—মদন, এক নম্বরের ফাঁকিবাজ! আমিও বেরিয়েছি, অমনি সেও জানলা-দরজা বন্ধ করে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছে। দিনভর খালি এখানে-ওখানে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য আমার ফেরার আগেই সচরাচর ফিরে আসে।

আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ফলস্বরূপ মদনের দেখা নেই!

অগত্যা আপনা হাত— জগন্নাথ! প্রথমেই জানলাগুলো সব খুলে দিলাম। তাকের ওপর রুমফ্রেশনারটা ছিল। স্প্রে করতে গিয়ে দেখি ফসফস আওয়াজ হচ্ছে! ওটা শেষ!

এমন সময়ই শেষ হতে হল! বাধ্য হয়েই আমার দামি পারফিউমটা স্প্রে করে দিলাম। অন্তত এই অসহ্য ভ্যাপসা গন্ধটা তো যাবে! মনে মনে তখন মদনের পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ করে চলেছি। আশ্চর্য! রুমফ্রেশনারটা যে শেষ হয়ে গেছে, সেটাও তার খেয়াল নেই। নতুন কিনে আনা তো দূর! এত টাকা দিয়ে ওকে রেখেছি কেন আমি? পরের বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্য?

মনে মনে গরম হয়ে উঠি। একবার ফিরুক হতভাগা, তারপর ওর হচ্ছে!

ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি কোনওমতে গায়ে দু-মগ জল ঢেলে এলাম। শরীর আর মাথা তো ঠান্ডা হল। কিন্তু পেটের ভেতরে ইঁদুরের রেস চলছে! মদন কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। তাই নিজের হাত পুড়িয়েই কিছু বানিয়ে নিতে হবে। ফ্রিজে হয়তো এক-দু-টুকরো ব্রেড এখনও আছে। তার সঙ্গে ডিমের একটা ওমলেট আর চা যথেষ্ট!

রান্নাঘরে ঢুকে বুঝলাম যে কাজটা যতটা সহজ মনে হচ্ছিল, ঠিক ততটা নয়। ফ্রিজ থেকে পাঁউরুটি আর ডিম উদ্ধার করা গেলেও চায়ের পাতা, চিনি কোথায় রাখা থাকে কিছুই জানি না! তাকের ওপর সারি সারি শিশি। তার কোনটায় চিনি, কোনটায় নুন, কোনটায় কী, সেসব সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞানই নেই। নিজের কিচেনের চেয়ে বরং ল্যাবরেটরিটা আমার কাছে অনেক বেশি চেনা!

প্রায় অসহায়ের মতোই তন্ন তন্ন করে খুঁজছি সব উপকরণ। খুঁজতে খুঁজতেই রান্নাঘরের ঠিক জানলাটার সামনে এলাম।

ঠিক তখনই... একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ নাকে এল!

অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ!... এমন গন্ধ তো আগে কখনও পাইনি! কেমন যেন নেশা ধরানো সুবাস...।

আমার ইন্দ্রিয়গুলো সব সতর্ক হয়ে উঠল। এটা কীসের গন্ধ?... রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া আসছে। তার সাথে সাথেই গন্ধটা ঝাপটা মেরে ঢুকে পড়ছে। খুব তীব্র নয়... কিন্তু...

ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কেমন তা জানি না। ডেমোনস্ট্রেশনের সময়ে নাকে মাস্ক পরেছিলাম। কিন্তু শুনেছি গন্ধটা মিষ্টি।...

গন্ধটা কি এইরকম?... কীসের গন্ধ এটা...? ক্যামোফ্লেজিয়া...?

— 'প্রতাপ... প্র-তা-প!'

প্রায় মৃত্যুভয়েই আর্তচিৎকার করে উঠেছি। বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করছে। একটা বিরাট টারবাইনের মতো ধক-ধক করে চলছে! ভীষণ রকমের আকুলি-বিকুলি! বোধহয় এখনই হার্টফেল করব... আর সময় নেই... সেই মারাত্মক মারণাস্ত্র আজ আমায় শেষ করেই ছাড়বে!

— 'স্যার... স্যার...'

প্রতাপ বোধহয় ঘাসফুল পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত ছিল। চিৎকার শুনে কাটারি হাতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

— 'কী হয়েছে স্যার...'?

ভয়ে গলা কাঁপছে। কোনওমতে বললাম— 'ওটা কীসের গন্ধ?'

প্রতাপ জোরে জোরে বেশ কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে গন্ধটা শুঁকল। আমি প্রায় দমবন্ধ করে রেখেছি। কিছুতেই ওই বিষ নিশ্বাস নেব না আমি... কিছুতেই না!

— 'ওঃ...' সে গন্ধটা অনুধাবন করেই হেসে ফেলেছে— 'এটা তো জুঁই ফুলের গন্ধ।'

— 'জুঁই ফুল!' আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কে বলতে পারে, ক্যামোফ্লেজিয়ার ডিএনএ গঠনে হয়তো জুঁই ফুলের অবদানও আছে! হয়তো তার গন্ধটা জুঁইফুলের মতোই!

— 'জুঁই ফুলের গন্ধ! এখানে জুঁই ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসবে?'

প্রতাপ আমার অবস্থা দেখে অবাক হয়। আস্তে আস্তে বলে— 'আপনার মনে নেই স্যার? আপনিই তো চারাগাছটা নিয়ে এসেছিলেন। বাগানে জায়গা ছিল না বলে রান্নাঘরের পেছনেই লাগিয়েছিলাম আমি।'

— 'কেটে ফ্যালো।'

সে বোধহয় আমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। কেমন বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বুঝতে পারছে না যে কী করবে।

— 'একদম গোড়া থেকে কেটে ফ্যালো।' আমি জোরাল গলায় বলি— 'জুঁই ফুলের গাছ চাই না আমার। একদম উপড়ে ফ্যালো। এই গন্ধ যেন আর আমি না পাই।'

সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

— 'ঘাসফুলগুলো সব ছেঁটে দিয়েছ?'

— 'হ্যাঁ'।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি— 'ঠিক আছে... এটাকেও...'

— 'ঠিক আছে স্যার।'

প্রতাপের মুখ বিষণ্ণ। বাগানের প্রত্যেকটা ফুল, গাছ তার বড়ো প্রিয়। বড়ো যত্নে, প্রায় সন্তানের মতো করেই সে বড়ো করে তুলেছে প্রত্যেকটা গাছ। আর আজ তাকেই আমি সেগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি!

মনে হল ওকে কসাইয়ের কাজ দিয়েছি। একবার মনে হল ডেকে বারণ করে দিই। পরক্ষণেই মনকে বোঝাই...। কেউ বলতে পারে না... কেউ বলতে পারে না... হয়তো এই নিরীহ ফুলের মধ্যেই নিরীহতর মুখ করে বসে আছে ক্যামোফ্লেজিয়া! আমায় শেষ করার মতলবে বিষ সৌরভ ছড়াচ্ছে!

তখনও হাত-পা কাঁপছিল। কোনওমতে আবার বসার ঘরে ফিরে আসি। আজ আর রান্না করার মতো অবস্থা নেই। কোনওমতে শুকনো পাঁউরুটি আর জল খেয়েই চালাতে হবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল একটু ধাতস্থ হয়েছি। আস্তে আস্তে উঠে ল্যাপটপটাকে নিয়ে এলাম। অনেক কাজ পড়ে আছে। ড. হিঙ্গোরানির জন্য কিছু প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। ডক্টর কাজে গাফিলতি একদম বরদাস্ত করেন না।

ফ্রিজে নতুন একটা হুইস্কির বোতল ছিল। আমি সচরাচর খুব টেনসড না হলে ড্রিঙ্ক করি না। কিন্তু আজ একটা ড্রিঙ্ক নিজেই বানিয়ে নিয়েছি। যে অবস্থায় আছি তাতে একটু অ্যালকোহল পেটে না পড়লে কাজ হবে না।

ল্যাপটপে একমনে কাজ করতে করতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে বাইরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে তা খেয়াল নেই। হুইস্কির প্রভাবে হোক, বা অন্য যে-কোনো কারণে, ক্যামোফ্লেজিয়ার কথা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ফিরল মদনের ডাকে—

— 'বাবু!'

আগে ভেবেছিলাম ও এলে একচোট বকাবকি করব। কিন্তু এখন সে ইচ্ছেটা আর টের পেলাম না।

— 'আপনি আজ তাড়াতাড়ি ফিরেচেন!' সে একহাত জিভ কাটে— 'কিচু খাননি নিচ্চই!'

আমি শান্ত গলায় বলি— 'খেয়েছি'।

সে আবার জিভ কাটল, কার উদ্দেশে কে জানে। 'রাত্তিরে কী খাবেন বাবু?'

— 'রুটি কর'। একটু ভেবে জবাব দিই— 'আর ডিম কষা হলেই চলে যাবে।'

— 'আচ্চা'। ও চলে যাচ্ছিল। আমি পেছন থেকে ডাকি— 'শোন...'

— 'হ্যাঁ বাবু'।

— 'রুম ফ্রেশনারটা শেষ হয়ে গেছে। দোকান থেকে একটা নিয়ে আসিস।'

— 'অকে...'।

'অকে'-টা 'ওকে'-এর মদনীয় সংস্করণ। আমাকে প্রায়ই 'ওকে' বলতে শোনে। সেখান থেকেই রপ্ত করেছে।

মদন চলে গেল রান্নাঘরে। আমি আবার কাজে মন দিলাম। প্রোজেক্ট রিপোর্ট শেষ করতে করতেই রাত দশটা বাজল। তারপর কয়েকটা ই-মেল পাঠালেই আজকের মতো কাজ শেষ!

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটার ঘণ্টা পড়ছে। আমি প্রায় ল্যাপটপের মধ্যে মাথা গুঁজে ই-মেল টাইপ করছি, ঠিক তখনই মোবাইল ফোনটা তীব্র স্বরে বেজে উঠল।

একটু বিরক্ত হলাম। কাজের সময় ফোন বাজলে ভীষণ বিরক্ত লাগে। এখনও সাতটা ই-মেল পাঠাতে হবে আমায় দেশ-বিদেশের নানা বিজ্ঞানীকে। লম্বা লম্বা বয়ানের চিঠি। সময় লাগবে। তার ওপর একটাও স্পেলিং মিস্টেক হওয়া চলবে না। একটা বানান ভুল হলেও ডক্টর আমায় বকাবকি করে রাখবেন না। যথাসম্ভব সতর্ক হয়ে কাজ করছি।

এমন সময় কে আবার জ্বালাতে ফোন করল?

প্রথমে ভেবেছিলাম ফোন ধরব না। কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ফোনের ডিসপ্লেতে জ্বলছে-নিভছে— 'কলিং গৌতম'!

আমার মনে একটা তীব্র আশঙ্কা উন্মত্তের মতো নাচতে শুরু করল। গৌতম এখন ফোন করছে কেন? সচরাচর সে খুব একটা ফোন করে না। যা কথা হওয়ার তা ল্যাবেই হয়। আজও বেরিয়ে আসার আগে ওকে সমস্ত কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। ড. হিঙ্গোরানি ল্যাবে আছেন। আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি বলে ওকে ডিউটিতে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু সে ফোন করছে কেন? আবার কী হল?

তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরি...

— 'হ্যালো'!

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল গৌতমের ভাঙা ভাঙা উত্তেজিত স্বর— 'স্যার?'

— 'বলছি, বলো'।

ঠিক হাহাকারের মতো শোনাল তার কথাগুলো...

— 'ড. হিঙ্গোরানি ল্যাবে কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসম্ভব ব্রিদিং ট্রাবল। নিশ্বাস নিতে পারছেন না। আমি ওনাকে লাইফকেয়ার নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ইমিডিয়েটলি চলে আসুন।'

আমার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের নখ অবধি যেন বরফ হয়ে গেল! হাতটা ভীষণ অবশ লাগছে। ফোনটা ঠক করে হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে!

ব্রিদিং ট্রাবল... না... আবার ক্যামোফ্লেজিয়া!

লাইফকেয়ারের আইসিইউ-তে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন ড. হিঙ্গোরানি। ভেন্টিলেশন চলছে। ডাক্তারবাবু প্রথমে ভেতরে কাউকে অ্যালাউ করছিলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতির পর আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ড. হিঙ্গোরানির পাশের বেডটাতেই ড. সুকুমার বসু শুয়ে আছেন। তিনিও কোমায় আছেন। মুখটা বিবর্ণ। কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে সমস্ত রং শুষে নিয়েছে। চোখদুটো আঠা দিয়ে যেন আটকানো। অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ড. বসুর। ভারি কাচের চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকাতেন, তখন মনে হত একেবারে ভেতর অবধি দেখে নিচ্ছেন...

অথচ এই চোখদুটো হয়তো আর কখনও খুলবে না।

আর তার পাশেই ড. হিঙ্গোরানি...

অমন দাপুটে মানুষটাকে এত অসহায় আগে আর কখনও মনে হয়নি। কী শীতল নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে আছেন বিছানায়। মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া!

কেন জানি না... যদিও আমি... খুব শক্ত... খুব শক্ত মানুষ... আমি আমার বাবার মৃত্যুতেও কাঁদিনি... কিছুতেই আমার চোখে জল আসে না।

কিন্তু আজ কেঁদে ফেললাম! ড. হিঙ্গোরানির দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে এল। আর নিজেকে সামলাতে পারি না। কোনওমতে আইসিইউ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছি।

গৌতম বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। আমার অবস্থা দেখে সে ভুলে গেল যে আমি ওর স্যার। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে।

— 'স্যার...'

ওইটুকু বলারই অপেক্ষা ছিল। ওর বুকে মাথা রেখে ছোটো শিশুর মতো হাউ-হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওর চোখেও জল। ড. হিঙ্গোরানিকে ভালোবাসে না, এমন লোক বোধহয় নেই। ভীষণ মেজাজি লোক ঠিকই, কিন্তু দয়ামায়া কাকে বলে তা বোধহয় ওঁর কাছ থেকেই শিখতে হয়। কী ছিলাম আমি? কতটুকু ছিলাম? বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন ছিল চোখে। কিন্তু সংস্থান ছিল না। বাবার সামান্য রোজগারে স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সেই সময় ড. হিঙ্গোরানিই আমার হাত ধরেছিলেন। ঈশ্বর সকলের জীবনেই একজন না একজন দেবদূত পাঠান।

আমার সেই দেবদূত এখন আইসিইউ-তে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে!

অথচ আমার কিছুই করার নেই! কী অসহায় আমি!

গৌতম বিড়বিড় করে যেন আপনমনেই বলে— 'ফুলের বোকেটার জন্যই এই সর্বনাশ!'

আমি ওর কথাটা ঠিক ধরতে পারি না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে আবার

বলল— 'আপনি চলে যাওয়ার প্রায় তিনঘণ্টা পরে একটা ফুলের বোকে এসেছিল স্যার।'

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে অসুবিধে হল না যে গৌতমের সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত কোনদিকে।

— 'ক্যামোফ্লেজিয়া?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

— 'আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার?' ফিশফিশ করে বলল গৌতম— 'পরপর ইনসিডেন্টগুলো দেখুন। সব ক-টা সিম্পটম দেখুন। যখন আমি ড. হিঙ্গোরানির চিৎকার শুনে ছুটে যাই তখন ওনার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা যে উনি কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলেন। নার্সিংহোম শব্দটাও ঠিকমতো বলতে পারছিলেন না। একবার জল খেতে চাইছিলেন, কিন্তু যখন জল দিতে গেলাম তখন জলের দিকে এমন করে তাকালেন যেন জিনিসটা কী বুঝতে পারছেন না! এখানে আসার পর ডক্টর বললেন— মেজর কেস অব অ্যাসিস্টল। কোনও কার্ডিয়াক ইলেকট্রিকাল অ্যাকটিভিটি ছিল না তখন।'

ও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। বলাই বাহুল্য যে এই হার্ট অ্যাটাক, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিক্যুলার অ্যারিদমিয়া, কনফিউশন এবং অ্যাসিস্টল— এগুলো সব অ্যাকোনিটামের লক্ষণ! ক্যামোফ্লেজিয়াই যে সব কিছুর মূলে তা বুঝতে আর বাকি রইল না!

— 'বোকেটা কে পাঠিয়েছিল জানো?'

— 'না'। সে বলে— 'বোকেটার ওপর কোনও নাম ছিল কি না মনে নেই। একগুচ্ছ নানা রঙের ফুলের বোকে ছিল শুধু এইটুকু মনে আছে। আর যখন ড. হিঙ্গোরানি পড়ে গিয়ে ছটফট করছিলেন তখন তার পাশেই পড়েছিল বোকেটা।'

— 'ফাইন'। আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়াই— 'চলো গৌতম'।

— 'কোথায়'?

— 'অফিসে'। অজান্তেই নিজের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে— 'বোকেটা কে পাঠিয়েছে দেখা দরকার। লেটস গো।'

গৌতম প্রথমে একটু কিন্তু-কিন্তু করলেও পরে রাজি হয়ে গেল। ওর গাড়িতেই ফের আমরা ফিরে গেলাম ল্যাবে। ল্যাবরেটরির একটা চাবি সবসময় আমার সঙ্গেই থাকে। সুতরাং ভেতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! পুরো ল্যাবরেটরি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না বোকেটা! সেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! যে ঘরে ডক্টর পড়েছিলেন সে ঘর থেকে শুরু করে ডাস্টবিন পর্যন্ত আমরা সব খুঁজে-ঘেঁটে দেখলাম। কিন্তু ফুলের তোড়াটা অধরাই থেকে গেল!

অনেকক্ষণ খোঁজার পর যখন আমরা হতক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলাম ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গৌতম রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। কোনওমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—

— 'কেউ সরিয়ে নিয়েছে। আমি শিওর বোকেটা এখানেই পড়েছিল... কিন্তু কেউ...'

— 'কে?'

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবছে। একটু সময় নিয়ে আবার বলল—

— 'একটা কথা মনে হচ্ছিল স্যার।'

আমি ল্যাবরেটরির টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেতে খেতে বলি— 'কী?'

— 'ড. টোডি, ড. বসু ও ড. হিঙ্গোরানির মতো লোক এত বড়ো একটা কাঁচা কাজ করলেন কী করে?'

— 'মানে?'

— 'মানে কোনও অ্যান্টিডোটের বন্দোবস্ত না করেই ক্যামোফ্লেজিয়ার মতো বিষধর জিনিস আবিষ্কার করবেন, এত বড়ো মূর্খ কি তাঁরা ছিলেন?'

আমি গৌতমের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। এই কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি কেন?

কিন্তু অ্যান্টিডোট যদি থাকে তবে সেটা তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করেননি কেন?

গৌতমকে কথাটা বলতেই ওর উত্তর— 'হয়তো সুযোগ পাননি। বোঝার আগেই বিষ কাজ করতে শুরু করেছে।'

— 'হতে পারে'। আমি উত্তেজিত— 'তাহলে সেক্ষেত্রে তার অ্যান্টিডোট এখানেই থাকবে। হয় অ্যান্টিডোট, কিংবা তার ফর্মুলা। যতদূর জানি অ্যাকোনিটামের অ্যান্টিডোট হিসেবে নাক্স ভম কিংবা ক্যাম্ফর ইউজ হয়। একবার গোটা ফর্মুলাটা পেয়ে গেলে বানিয়ে নিতেও অসুবিধে হবে না। চিয়ার আপ... খোঁজো গৌতম... খোঁজো...।'

শুরু হল খোঁজাখুঁজি। গৌতম আর আমি দুজনেই বুঝতে পারছিলাম যে ক্যামোফ্লেজিয়ার প্রকোপ এরপর আমাদের ওপরই পড়বে। আমাদের অবস্থাও ড. টোডি, ড. বসু বা ড. হিঙ্গোরানির মতো হবে। তাই অ্যান্টিডোট বা তার ফর্মুলাটা পাওয়া আমাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই মরিয়া হয়ে খুঁজছি! যে-কোনো মূল্যেই হোক জিনিসটা পেতেই হবে। নয়তো আমাদেরও শেষ করে ছাড়বে ওই ছদ্মবেশী ঘাতক!

ড. হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাব আজ খোলা ছিল। উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই দরজা বন্ধ হয়নি। আর কেউ পাসওয়ার্ড জানত না।

মনে হল, হয়তো ডক্টর অ্যান্টিডোটটাও ওই ঘরেই রেখেছেন।

— 'গৌতম, তুমি বাইরেটা খোঁজো।' আমি প্রাইভেট ল্যাবের দিকে পা বাড়াই— 'আমি ভেতরটা দেখছি।'

ল্যাবের ভেতরে সারি সারি শিশিতে নানারকম কেমিক্যাল। কোনোটা সবুজ, আবার কোনোটা বা গোলাপি। ছোটো ছোটো কাচের শিশিতে নানারকম তরল। এত শিশি আর বোতলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। এর কোনটায় আমাদের ইপ্সিত বস্তু লুকিয়ে আছে? অ্যান্টিডোট ছাড়া ফুলটা তৈরি হল কী করে? যখন এটা

তৈরি হচ্ছিল তখন থেকেই নিশ্চয় বিজ্ঞানীরা গ্যাস মাস্ক পরে ছিলেন না। ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কখনও না কখনও তাদের নাকে গিয়েই থাকবে। মনে আছে ড. হিঙ্গোরানি বলেছিলেন— 'গন্ধটা মিষ্টি'। যদি গন্ধ তাদের নাকেই না যায় তবে বুঝলেন কী করে যে গন্ধটা মিষ্টি!

দৃঢ় বিশ্বাস হল, তার মানে অ্যান্টিডোট আছে। গবেষণা চলাকালীন বিজ্ঞানীরা ফুলের গন্ধও পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাদের কিছু হয়নি। অ্যাকোনাইট কাজ করতে বেশি সময় নেয় না। একঘণ্টা দু-ঘণ্টার মধ্যেই কাম তামাম করে ফেলে।

সুতরাং তখন তারা নিশ্চয়ই অ্যান্টিডোট নিয়েছিলেন। ওটা এখানেই কোথাও আছে।

কিন্তু কোথায়?

ল্যাবের ভেতরে একটা মস্তবড়ো ফ্রিজার। মাইনাস সিক্স ডিগ্রিতে সেট করা আছে। এটাকে মাইনাস ফরটি ডিগ্রি অবধি সেট করা যায়। গ্লাভস পরে ফ্রিজারের দরজা খুলতেই হাড় হিম করা ধোঁয়া বেরিয়ে এল। সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও কিছু ছোটো ছোটো শিশি। গায়ে লেবেল সাঁটা। সামনের ব্লকে বড়ো বড়ো করে লেখা— 'অ্যান্টিডোটস'।

এগুলোই অ্যান্টিডোট! নানান বিষ নিয়ে কাজ করেন ডক্টর। তাই প্রত্যেকটা বিষের ওষুধও তৈরি করা থাকে। সারিসারি শিশির মধ্যে আর্সেনিক অ্যান্টিডোট, থ্যালিয়াম অ্যান্টিডোট, সায়ানাইড অ্যান্টিডোট, নিউরোটক্সিন এলডি ফিফটির অ্যান্টিডোট— সবই চোখে পড়ল।

কিন্তু ক্যামোফ্লেজিয়া নেই!

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যামোফ্লেজিয়ার অ্যান্টিডোট এখানে নেই কেন? তবে কি অন্য কোথাও...?

প্রথমে সব ক-টা শিশি নামিয়ে নামিয়ে দেখলাম।... নেই! ল্যাবরেটরি প্রায় তছনছ করে খুঁজছি...। নেই!... কাগজপত্র, ফাইল ঘেঁটে দরকারি-অদরকারি কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে একশা করলাম। আমারই তৈরি করা প্রোজেক্ট রিপোর্ট, ডিফেন্স মিনিস্ট্রির চিঠি, ক্যামোফ্লেজিয়ার ইনশিয়োরেন্স পেপার— সব বেরোল...

কিন্তু ফর্মুলা?

... নেই!

হতক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপরই বসে পড়েছি। আবার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। ড. হিঙ্গোরানির জন্য নয়। নিজের কথা ভেবে! শেষ পর্যন্ত আমাকেও বিষ নিশ্বাস নিয়ে অসহায় গিনিপিগের মতো মরতে হবে! চোখের সামনে দেখলাম— ক্যামোফ্লেজিয়া আমার পেছনে ধাওয়া করছে। নীল বিষাক্ত শরীরে আমি...

...না। এভাবে, এত সহজে মরব? আমিও বিজ্ঞানী। এই কাগজপত্রের মধ্যে আর কিছু না হোক, কোথাও না কোথাও ক্যামোফ্লেজিয়ার ডিএনএ কোড রয়েছে। যদি একবারও সেটা পাই, তবে নিজেই তার অ্যান্টিডোট তৈরি করতে পারি। শুধু একবার

ঠান্ডা মাথায় আমায় কাগজটা দেখতে হবে।

ফাইলের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রাইভেট ল্যাব থেকে। গৌতম ততক্ষণে সমস্ত ডিভিডি, সিডি চালিয়ে দেখে নিয়েছে। কম্পিউটার তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। ড. টোডি, ড. বসু আর ড. হিঙ্গোরানির নিজস্ব কম্পিউটার তাদের কেবিনেই থাকে। সব ক-টা দেখেছে, এমনকি আমার কম্পিউটারও ছাড়েনি। যদি কোনও সিডি-তে বা কম্পিউটারে ক্যামোফ্লেজিয়ার প্রেজেন্টেশন থাকে। কিংবা তার অ্যান্টিডোটের প্রেজেন্টেশন। আজকাল বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারেই তাদের রেকর্ড বেশি রাখেন। তাই সে তাও দেখতে বাকি রাখেনি।

কিন্তু ড. হিঙ্গোরানিকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তিনি কম্পিউটারে কিছু রাখার লোক নন।

দেখা গেল আমার চেনাটাই সঠিক। গৌতম সব কম্পিউটার ঘেঁটেও কিছু পায়নি। হয় সেগুলো কেউ সরিয়ে দিয়েছে। নয়তো ডক্টররা কম্পিউটারে জিনিসটা রাখেননি।

— 'এখন কী করব স্যার?'

তার কণ্ঠস্বরে হতাশা— 'কিছুই তো পেলাম না।'

— 'পাওয়া যাবে গৌতম, নিশ্চয়ই পাব আমরা।' ওকে সান্ত্বনা দিই— 'আমি বাড়িতে বসে ঠান্ডা মাথায় এই কাগজপত্রগুলো দেখব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যেই কিছু আছে। যদি ক্যামোফ্লেজিয়ার ডিএনএ কোডও পেয়ে যাই তবে তা থেকে অ্যান্টিডোট বানিয়ে নিতে পারি। শুধু এই মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার।'

সে ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ে।

— 'এখন তুমি বাড়ি যাও।' আমি আস্তে আস্তে বললাম— 'সকাল দশটার আগে তো ভিজিট করতে দেবে না। আমিও আসব।'

গৌতম সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ল— 'চলুন স্যার, আপনাকে বাড়িতে ড্রপ করে দিই'।

— 'চলো'।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সকাল সাতটা বাজল। সারারাত জেগে, খোঁজাখুঁজি করে দুজনেই ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম দরকার।

আসার পথে আমাদের দুজনের কোনও কথা হয়নি। কোনও এক ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। আমি অন্যমনস্কভাবে ফাইলের কাগজ উলটেপালটে দেখছিলাম। গৌতম ড্রাইভ করছিল। কোনও কথা বলেনি। আমাদের অমোঘ আশঙ্কা একটা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

আমাকে ড্রপ করার সময় গৌতমই প্রথম মুখ খুলল— 'আমার মনে হয় স্যার, কেউ সব রেকর্ড মুছে দিয়েছে। আমাদের মধ্যেই কেউ... আর বোধহয় বাঁচার উপায় নেই।'

দেখলাম ওর উদ্‌ভ্রান্ত চোখে জল চিকচিক করছে।

আমারও মনে এই সন্দেহটা ঘুরছিল। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই সরিয়ে ফেলেছে অ্যান্টিডোট।

হয়তো কাগজপত্রও গায়েব করে দিয়েছে!

বুঝতে পারছিলাম না ওকে কী বলব। কিছু বলার আগেই সে আবার বলল—

— 'আসছি স্যার, সাবধানে থাকবেন।'

গৌতম চলে গেল। আমি নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াই। একটু বিশ্রাম দরকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। একটু ঘুম...

কিন্তু... এ কী!

বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই চমকে উঠলাম! কাল প্রতাপকে বলেছিলাম ঘাসফুলগুলো ছেঁটে ফেলতে! ওকে কাটারি দিয়ে ঘাসফুল ছাঁটতেও দেখেছি...

তবে ওগুলো কী!...

বাগান আলো করে ঘাসের মধ্যে ছোটো ছোটো সাদা ফুল শিশির মেখে ঝলমল করছে! কাল সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু আজ প্রায় গোটা বাগান জুড়েই...!

মনে হল ফুলগুলো বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে! এত তাড়াতাড়ি এত ঘাসফুল কোথা দিয়ে এল! সংখ্যায় প্রচুর! আর সারা বাগানই প্রায় ছেয়ে ফেলেছে! এগুলো কালও ছিল না...।

ঘাসফুল নয়... এ ঘাসফুল হতেই পারে না!

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম। পুরো বাগানের ঘাসই উপড়ে ফেলব। ঘাস কাটার মেশিনটা আছে স্টোররুমে। ওটা দিয়েই নিকেশ করব রক্তবীজের বংশধরদের। ঘাসও থাকবে না... ঘাসফুলও নয়!

আজ আর প্রতাপকে ডাকলাম না। এ কাজ নিজের হাতেই করা ফেলা ভালো। ওকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমিই দেখে নেব...!

গ্রাস কাটার চলতে শুরু করল।

চোখের সামনে দেখলাম ঘাসের গোড়া থেকে উপড়ে যাচ্ছে। সাদা ছোটো ছোটো ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ছে ছিন্নমূল হয়ে। নাক আগেই ঢেকে নিয়েছিলাম। তাই গন্ধ পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। ঘাস কাটতে কাটতেই একটা পৈশাচিক আনন্দ টের পাই। যেন আমার মাথায় দানব ভর করেছে। সব কেটে ফেলব... সব শেষ করব... সব ক-টাকে যমের দোরে পাঠাব।

দেখতে দেখতে গোটা বাগান সাফ হয়ে গেল। ঘাসগুলো বিধ্বস্ত হয়ে উপড়ে পড়ে আছে! তার সঙ্গে ঘাসফুলও!

হিংস্র আনন্দে তাকিয়ে দেখলাম আমার বাগান ন্যাড়া হয়ে গেছে! বিবর্ণ হয়ে গেছে! প্রতাপ ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছে! বাগানে কোনও ঘাস নেই! সে পাগলের মতো ছুটে আসে। প্রায় হাহাকার করে ওঠে—

— 'স্যার... এ কী করছেন!'

আমি রক্তচোখে ওর দিকে তাকাই। নির্ঘুম এক রাত কাটিয়ে, দুশ্চিন্তায় চেহারাটা উন্মাদের মতো লাগছিল। লাল চোখ, উশকো-খুশকো চুল, মুখে না কামানো দাড়ি! ও

বোধহয় এই রূপ দেখে ঘাবড়ে গেল। কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, ছোটো ছোটো ফুলের ঝাড় জ্বলজ্বল করছে। এত ছোটো ছোটো নানা রঙের ফুল কবে এল আমার বাগানে! একেবারে গাছ আলো করে থোকায় থোকায় ফুটে আছে।

মনের ভেতরের সন্দেহ আর আশঙ্কা একসঙ্গে দানবের মতো দাপাতে শুরু করে। ওগুলো কী? কী?...

বলা যায় না... কিচ্ছু বলা যায় না... ও ফুল যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো রঙে ছদ্মবেশে ফুটে থাকতে পারে।

না, ফুল চাই না আমি... এ বাগানে কোনও ফুল থাকবে না... কোনও ফুল... কোনও গাছ নয়! বরং বাগানটাই দরকার নেই! বাগানটাই থাকবে না... ওড়াও... সব উড়িয়ে দাও... কিচ্ছু দরকার নেই!... নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি কিছু না... কোনও সৌন্দর্য, কোনও সৌরভ— কিচ্ছু না!

ধ্বংস হোক... ধ্বংস হোক সব...

প্রতাপকে দিয়ে কাজটা করালাম না। বলা যায় না, হয়তো মায়ায় পড়ে একটা-দুটো গাছ রেখে দেবে। তাই নিজের হাতেই এক-এক করে সব ধ্বংস করলাম। আমার বাগান নিমেষের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। যে গাছগুলোকে নিজেই এনেছিলাম, সাজিয়ে তুলেছিলাম বাগান, সেই গাছগুলোকে নির্মম হাতে তুলে ফেলে দিলাম!

ফুল বড়ো ভালোবাসতাম আমি...

আজ সবচেয়ে বেশি ভয় পাই এই ফুলকেই... ঘেন্না করি... ঘেন্না করি...

৫

বিকেলের দিকে ভিজিটিং আওয়ারে আর-একবার দেখে এলাম দুই বৈজ্ঞানিককে।

অবস্থার উন্নতি কিছুই হয়নি। বরং ইনটেনসিভ কেয়ারে ডাক্তারদের ব্যস্ততা দেখে মনে হল আজ বোধহয় দুজনেরই অবস্থা খারাপ।

আমরা আজ আর ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম না। বাইরে দাঁড়িয়েই জানলার কাচ দিয়ে দেখলাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুই বৈজ্ঞানিককে।

ড. হিঙ্গোরানির ছেলে বিদেশে থাকে। খবর পেয়েছে, কিন্তু এসে পৌঁছোতে পারেনি। ড. বসুর স্ত্রী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। কত রাত ঘুমোননি কে জানে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। তার দিকে তাকাতেও পারছিলাম না! কথা বলার সাহসও হল না।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একজন হোমরা-চোমরা এসেছিলেন আজ। গম্ভীর মুখ করে বাইরে থেকেই ব্যাপারটা দেখে গেলেন। তার মুখে একটা নিরাশার ছাপ লক্ষ করছিলাম। সেটা আবিষ্কারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য না দুই বিজ্ঞানীর অবস্থা দেখে, কে

জানে!

গোটা ভিজিটিং আওয়ারটাই বাইরে দাঁড়িয়ে কেটে গেল। বিকেলবেলা ফিরে এলাম বাড়িতে। বাগানের জায়গায় এখন মরুভূমির মতো নিষ্ফলা একটুকরো জমি খাঁ-খাঁ করছে। অন্য সময় হলে বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠত। কিন্তু আজ আমি নিষ্ঠুর! ভীষণ নিষ্ঠুর!

স্নায়ুর ওপর দিয়ে ভীষণ চাপ যাচ্ছিল। এক পেগ হুইস্কি তৈরি করতে করতেই অনুভব করলাম...

গোলাপের গন্ধ! সারা ঘরে যেন হালকা গোলাপের গন্ধ ছড়িয়ে আছে!...

কিছুক্ষণের জন্য যেন হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে গেল...। গোলাপের গন্ধ কোথা দিয়ে আসছে? বাগানের ত্রিসীমানায় আগেই কোনও গোলাপ ছিল না। এখন তো বাগানটাই নেই! তবে গোলাপ কোথা দিয়ে এল?

হঠাৎই বুঝতে পারলাম শরীরটা খারাপ লাগছে। হার্টবিট বেড়ে গেছে! আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি।

আমার ড্রয়ারে সবসময়ই নেস্ট্রোমিফিন রাখা থাকে। অ্যালার্জির ওষুধ। ফয়েল থেকে বের করে একটা খেয়ে নিলাম। গোলাপের গন্ধটা তাড়ানো দরকার। কোথা থেকে আসছে কে জানে। জানলা-দরজা বন্ধ করে রুমফ্রেশনার ছড়িয়ে দিই চতুর্দিকে। মদন আজ সকালেই এই নতুন রুম ফ্রেশনারটা দোকান থেকে নিয়ে এসেছে বোধহয়।

সব কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফের কাজে লেগে যাই। ল্যাব থেকে আনা কাগজগুলো খুব মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছি। অদরকারি কাগজপত্রই বেশি। ক্যামোফ্লেজিয়ার কয়েক কোটি টাকার ইনশিয়োরেন্স আছে। তার কাগজপত্র, ডিফেন্সের চিঠি, কিছু কেমিক্যাল কেনার রশিদের কপি, অ্যাকোনিটাম কেনার রশিদ...

দেখতে দেখতেই চোখে পড়ল একটা কাগজে কী যেন হিজিবিজি লেখা...

কোনও সন্দেহ নেই যে এটা ডক্টর হিঙ্গোরানির হাতের লেখা। তার মতো দুর্বোধ্য হিব্রুর মতো হাতের লেখা আর কারোর নেই।

কিন্তু এসব কী হিজিবিজি এঁকেছেন! দেখে মনে হচ্ছে একটা প্ল্যানিং। ডিএনএ কোডের প্ল্যানিং?

উত্তেজনায় শরীর টানটান হয়ে উঠল। এই তবে ক্যামোফ্লেজিয়ার ডিএনএ কোডের ছবি। এত খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল!

কিন্তু এ কী! এর মধ্যে অ্যাকোনিটামের ডিএনএ তো দেখছি না। বরং কিছু সাপের বিষের সাইকেন দেখা যাচ্ছে! ক্যামোফ্লেজিয়া সাপের বিষে তৈরি! ডক্টর হিঙ্গোরানি কি তবে ভুল বলেছিলেন? বা চেপে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে আসল সত্যিটা?

আমি ভালো করে কাগজটা দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু ক্রমশই শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। গোলাপের গন্ধটা আরও তীব্র...। ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। চোখে ঝাপসা দেখছি, বুক ধড়ফড় করছে...

সব দরজা-জানলা বন্ধ! তবে গোলাপের গন্ধ আসছে কোথা দিয়ে! মদন কি ঘরে কোথাও গোলাপ এনে রেখেছে নাকি? আমি হুইস্কির গ্লাসে কয়েকটা উত্তেজিত চুমুক লাগাই, তারপর ফয়েল থেকে আরও কয়েকটা নেস্ট্রোমিফিন বের করে টপাটপ খেয়ে ফেলি। অ্যালার্জিটা ক্রমশই বাড়ছে। দেখতে হবে গোলাপ কোথায় রাখা আছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, সমস্ত ঘর খুঁজেও কোথাও গোলাপের একটা পাপড়ি তো দূরের কথা, একটা কাঁটাও নজরে এল না! কোথাও গোলাপ নেই এই বাড়িতে। তবে?

আবার একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে চেপে বসল! ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কি তবে গোলাপের মতো! ক্রমশই মনে হচ্ছে বুকের ওপর কীসের যেন একটা ভয়ানক চাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

আমি জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করি...। কিন্তু পারছি না! দেহ অবশ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে, দরদর করে ঘামছি।

বুঝতে পারছি এ যাত্রায় বোধহয় আর বাঁচব না! নার্ভগুলো কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, বুকে ভীষণ কষ্ট! এ ক্যামোফ্লেজিয়ার সিম্পটম! নির্ঘাৎ ক্যামোফ্লেজিয়া...! কিন্তু কোথায়? আমার বাগানে আর কোনও ফুল নেই। আশেপাশে কোনও ফুল চোখে পড়েনি। ভেবেছিলাম ক্যামোফ্লেজিয়াকে আমি অনেক দূরে ফেলে আসতে পেরেছি...

আঃ... অক্সিজেন... একটু অক্সিজেন... আমি ধড়ফড় করছিলাম একটু অক্সিজেনের জন্য... চোখে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে... মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে বুঝতে পারছি... বুঝতে পারছি ক্যামোফ্লেজিয়া আমার খুব কাছেই আছে...

জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পেলাম আমার মোবাইল ফোন বাজছে। বাজছে আমার খুব প্রিয় রিংটোন... কারেন কার্পেন্টারের গলা—

— 'জাস্ট লাইক মি... দে ওয়ান্ট টু বি... ক্লোজ টু ইউ...'

তারপরই সব অন্ধকার!

৬

মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ভেসে বেড়াচ্ছি!

না, এই জবরজং শরীরটা নিয়ে নয়। বরং বেশ সূক্ষ্ম একটা অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। এত হালকা নিজেকে কখনও মনে হয়নি। এত মুক্তও নয়। অনাবিল অন্ধকারের মধ্যে যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছি!

সাঁতরাতে সাঁতরাতেই টের পেলাম যে শরীরটা হঠাৎ করে বড্ড ভারী হয়ে যাচ্ছে। আঃ... অন্ধকারের মধ্যে কে আলো জ্বেলে দিল দুম করে? শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে নানারকম আওয়াজ কানে আসছে।

দপ করে যেন চোখের সামনে লক্ষ হ্যালোজেন জ্বলে উঠল। জন্মযন্ত্রণা যেন দ্বিতীয়বার অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল আমি কোনও গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছি,

চতুর্দিকে অনেক আওয়াজ, অনেক আলো আমায় কষ্ট দিচ্ছে। অনুভূতিগুলো যেন একটা অদ্ভুত পীড়নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।

কোনওমতে চোখ মেলে তাকাই... কে আমায় এমনভাবে বিরক্ত করছে? কেনই বা করছে? দিব্যি তো ছিলাম একা একা! কে...?

আলোর তীব্রতায় কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে ফেলেছিলাম। আবার তাকানোর চেষ্টা করি... এত আলো!... আমি কোথায়?...

— 'অ-নু-প-ম!'

কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে! আমার মুখের সামনে দুটো ঝুঁকে পড়া উদ্‌বিগ্ন মুখ!

— কে?... চিনতে পারলাম না... সব ঝাপসা...! শরীরটাকে ভীষণ ভারী মনে হচ্ছিল। কোনওমতে উত্তর দিই— 'উঁ'।

— 'থ্যাঙ্ক গড! জ্ঞান ফিরেছে!' কে যেন সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে— 'ওঃ ঈশ্বর... হি ইজ ওকে... হি ইজ গেইনিং সেন্স...'

ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ঘুমটা যেন আমায় চেপে ধরল।

আবার অন্ধকার!

কতক্ষণ মড়ার মতো ঘুমিয়েছি জানি না। অনেকক্ষণ একটানা ঘুমোনোর পর আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরে পেলাম। এবার বুঝতে পারি নার্সিংহোমে আছি। এটা আইসিইউ। আমার নাক থেকে বোধহয় সদ্যই অক্সিজেন মাস্ক খোলা হয়েছে।

— 'অনুপম, কেমন লাগছে এখন?'

পরিচিত গলার স্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাই। যা দেখি তাতেই চক্ষু চড়কগাছ! আমাকে রাখা হয়েছে ড. হিঙ্গোরানি ও ড. বসুর নার্সিংহোমেই। ইনফ্যাক্ট তাদের পাশেই!

বিস্ময়ের কথা এটা নয়। যা দেখে চমকে উঠলাম, তা হল...

উপরোক্ত দুজনই আমার বিছানার পাশে বসে উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে!

বিস্ময়ের পরই অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে গেল। পারেনি... ক্যামোফ্লেজিয়া এই দুজনকে নিয়ে যেতে পারেনি... ক্যামোফ্লেজিয়া হেরে গেছে... হেরে গেছে... সৃষ্টি স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে পারেনি...

আমি প্রায় লাফ মেরে উঠে বসতেই যাচ্ছিলাম, তার আগেই ড. হিঙ্গোরানি আমায় ধরে ফেলেছেন। সস্নেহে টেনে নিলেন বুকে— 'ওয়েলকাম ব্যাক অনুপম! যা ভয় দেখিয়েছিলে! সাতদিন ধরে তোমার সেন্স ছিল না। এমন কাণ্ড একজন বিজ্ঞানী হয়ে করলে কী করে?'

আমি বলতে গেলাম— 'ক্যামোফ্লেজিয়া...'

আমাকে থামিয়ে দিয়েই ড. বসু বললেন— 'ক্যামোফ্লেজিয়া নয়। তোমার রোজ

এসেন্সে অ্যালার্জি। তার সঙ্গে প্রচুর নেস্ট্রোমিফিন খাওয়া এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সঙ্গে অ্যালকোহল! তুমি একটা বিজ্ঞানী অনুপম! তোমার মনে ছিল না যে নেস্ট্রোমিফিন যতই নিরীহ অ্যালার্জির ওষুধ হোক না কেন, অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশলে মারাত্মক বিষ হয়ে দাঁড়ায়? ক-টা খেয়েছিলে ট্যাবলেট?'

মনে করার চেষ্টা করি— 'চার-পাঁচটা হবেই...।'

ড. হিঙ্গোরানি শাসনের ভঙ্গিতে বলেন— 'তোমার লজ্জা করে না? ওপরে যাওয়ার বন্দোবস্ত তো প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলে। তোমার কাজের লোক মদন ঠিক সময়ে উদ্ধার না করলে কোথায় থাকতে তুমি?'

এরপর তাঁদের মুখ থেকেই শুনি মদন আমায় ওই অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করে গৌতমকে। মদন মোটামুটি এসব কাজ করতে পারে। প্রতাপও পারে। গৌতমের কথা মতো ওরা দুজনেই আমাকে ওই অবস্থায় এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। এই সাতদিন রোজ দু-বেলা গৌতম এসেছে। মদন আমায় দেখতে না পেলেও, আইসিইউ-র সামনে থেকে এক মুহূর্তও নড়েনি। আজ আমার হুঁশ ফিরেছে শুনে মন্দিরে ছুটেছে পুজো দিতে।

আবেগে চোখে জল এল। এরা সবাই আমায় কত ভালোবাসে! অথচ এই ক-দিন আমি শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভেবে গেছি... কী স্বার্থপর আমি...!

মনে একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছিল। থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলি—

— 'ডক্টর?'

— 'বলো'।

— 'গোলাপের গন্ধটা কোথা থেকে এল? আমার ঘরে কোথাও গোলাপ ছিল না। বাগান তো আমি নিজেই উড়িয়েছি। তবে...?'

— 'সেটার উত্তরও মদন তোমার ডাক্তারকে দিয়েছে।' ড. হিঙ্গোরানি হাসলেন— 'তুমি ওকে রুম ফ্রেশনার আনতে দিয়েছিলে। ও জানত না যে তোমার রোজ এসেন্সে মারাত্মক অ্যালার্জি। বেচারা একটা রোজ এসেন্সের রুম ফ্রেশনার এনেছিল।'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ক্যামোফ্লেজিয়া নয়। আসল ভিলেন ওই রুম ফ্রেশনার। আমি ঘরে ঢোকার আগেই সম্ভবত মদন স্প্রে করে রেখেছিল। ঘরে ঢোকা মাত্রই ওই গন্ধটা পেয়েছি। গন্ধটা কাটানোর জন্য দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে বোকার মতো ওই রুম ফ্রেশনারটাই বারবার স্প্রে করেছিলাম। যার জন্য গোলাপের গন্ধ ক্রমশই বাড়ছিল!

আর তার সঙ্গে বাড়ছিল আমার অ্যালার্জি।

— 'অ্যান্ড দেন ফাইভ নেস্ট্রোমিফিনস উইদ অ্যালকোহল।' ড. হিঙ্গোরানি বললেন— 'আর-একটু হলেই চ্যাপটার ক্লোজড হচ্ছিল তোমার। বেঁচে যে আছো এই অনেক।'

আমি আনন্দে গদগদ হয়ে বলি— 'স্যার, আপনাদের দেখে যে কী আনন্দ হল কী বলি...। আমাদের যে কী অবস্থা হয়েছিল...।'

— 'হ্যাঁ জানি'। ড. বসু বললেন— 'তুমি তো একেবারে ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিলে।'

ওঁর কথা শুনে চমকে উঠলাম! উনি জানলেন কী করে? দুজনেই তো কোমায় ছিলেন!

কথাটা বলতেই উত্তর এল— 'ঘোড়ার ডিম ছিলাম! কিস্যু হয়নি আমাদের। স্রেফ অসুস্থতার অ্যাকটিং করে কয়েকটা দিন ছুটিতে কাটাচ্ছিলাম।'

আমি পুরো হাঁ! তবে? ক্যামোফ্লেজিয়া...? যা ভাবছিলাম... তার সবটাই কি...!

— 'ক্যামোফ্লেজিয়া'। হেসে ফেললেন ড. হিঙ্গোরানি— 'ক্যামোফ্লেজিয়ার ফর্মুলা শুনবে? বেশ, শোন তাহলে...।'

এরপর ডক্টর যা বললেন তাতে আমার আর-একবার হার্টফেল করার মতো দশা হল...

ডক্টর হিঙ্গোরানি, ড. বসু ও ড. টোডি— তিনজনে মিলে গোপনে ক্যানসারের ওপর রিসার্চ করছিলেন। ক্যানসারের ওষুধ বের করার চেষ্টা চলছিল। কাজ অনেকটাই গুটিয়ে এসেছে। অথচ এক্সপেরিমেন্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূলধন অপর্যাপ্ত। সরকারি সাহায্য চাইলেন। প্রত্যাখ্যাত হল তাদের আবেদন।

এদিকে কাজ এগোনোর জন্য টাকা চাই। কী করণীয়?

এই সময়ে ডক্টর টোডির মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি জোগাল। তিনি বললেন যে, সরকার জীবনদায়ী ওষুধের পেছনে টাকা খরচ করে না। কিন্তু মারণাস্ত্রের পেছনে করবে। তাই তিনজনে মিলে তৈরি করলেন এই সাইলেন্ট কিলারের পরিকল্পনা! নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতানোর জন্য, যাতে তাদের গোপন আবিষ্কারের কাজ ঠিকঠাক চলতে পারে।

— 'তাহলে... আমরা যে দেখলাম...! ক্যামোফ্লেজিয়া শুঁকে গিনিপিগগুলো মরল...?'

ড. বসুর সহাস্য উত্তর— 'ওগুলো রোগেভোগে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই ভাবলাম মার্সিডেথ দিয়ে দিই। ত্রিশ মিলিগ্রাম অ্যাকোনাইট আগেই ওদের শরীরে পুশ করা ছিল। একদম সঠিক মাত্রায়, সঠিক টেম্পারেচারে। যাতে ঠিক একঘণ্টা পরেই মারা যায়। আর ঠিক একঘণ্টা পরেই তোমরা ডেমো দেখেছিলে।'

আমি হাঁ। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

— 'তবে... তবে রং পালটানোর ব্যাপারটা...?'

— 'ওটাও প্রযুক্তিবিদ্যার কারিকুরি ডিয়ার।' ড. হিঙ্গোরানি হাসছেন— 'যে ডায়াসের ওপরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক মাথার ওপরই একটা ন্যানো প্রোজেক্টর ছিল। সেটা কন্ট্রোল করছিলেন ড. বসু। আমি সারফেসে যে রং রাখছিলাম উনি ঠিক সেইরকম আলোই প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ফুলটার ওপরে ফেলছিলেন। ওটার অরিজিনাল রং সাদা বলে মনে হচ্ছিল রং পালটে পালটে যাচ্ছে।'

— 'আর ডক্টর টোডি?'

ড. হিঙ্গোরানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন— 'ওনার মৃত্যুটা ওরিজিনাল। বড্ড ড্রিঙ্ক করছিলেন আজকাল। ওটা আমাদের প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। কথা ছিল আমি কাচের মধ্যে যে ফুলটা ছিল সেটা একদম নষ্ট করে ফেলব এবং মাথা ফাটিয়ে ক্যামোফ্লেজিয়া চুরি যাওয়ার নাটক করব। আর সেটা করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ কয়েকদিন পরেই ডিফেন্স ক্যামোফ্লেজিয়া নিয়ে যাবে। তার আগেই...'

— 'তাহলে ওটাও নাটক!'

— 'হ্যাঁ'। ড. হিঙ্গোরানি বললেন— 'ভেবেছিলাম যে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হতাশ হয়ে এমন জিনিস দ্বিতীয়বার আর তৈরি করার কথা বলবে না। কিন্তু তারা আমাদের ওপর চাপ দিতে লাগল দ্বিতীয়বার ক্যামোফ্লেজিয়া তৈরি করার জন্য। কী করে এড়ানো যায় তাই ভাবছিলাম। এর মধ্যেই ড. টোডি হার্টফেল করলেন। ওঁর হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল। মৃত্যুটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর মৃত্যুটাই আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেল। ঠিক তখনই দুজনে মিলে ঠিক করলাম এইরকম একটা নাটক করব। যাতে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হাড়ে হাড়ে টের পায় যে এই জাতীয় অস্ত্র কী মারাত্মক হতে পারে।' তিনি হাসতে হাসতে বললেন— 'আশা করি এতদিন কোমায় থাকার পর ওরা আর আমাদের নতুন করে ফের জিনিসটা আবিষ্কার করতে বলবে না। যথেষ্টই ভয় পেয়েছে।'

বিস্ময়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম। ব্যাপারটা যত পরিষ্কার হচ্ছিল ততই নিজের গালে চড় মারার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছিল।

তা সত্ত্বেও আমার মনে একটা কিন্তু ছিল।

— 'ডিফেন্স মিনিস্ট্রির টাকাটার কী হবে?'

— 'কী আর হবে?' ডক্টর সুন্দর হাসলেন— 'ওই কথা ভেবেই ক্যামোফ্লেজিয়ার একটা মোটা টাকার ইনশিয়োরেন্স করিয়ে রাখা হয়েছে। সেই টাকা থেকেই ওদের টাকা ফেরত যাবে। বাকি টাকাটা লাগবে আমাদের ক্যানসার রিসার্চ প্রোজেক্টে।'

— 'তার মানে ক্যামোফ্লেজিয়া...?'

— 'ওই নামে কিছু কোনওদিন ছিল না, এখনও নেই, আগামীতেও হবে না।' তিনি দুষ্টু বাচ্চার মতো হেসে উঠলেন— 'তোমরা যা দেখেছ সেটা নেহাতই একটা ঘাসফুল। আর বাদবাকি সব মায়া! এ কথা আগে আমরা তিনজন আর পরে এই নার্সিংহোমের ডক্টর জানতেন। তিনিও চমৎকার অ্যাকটিং করেছেন। আর এখন জানলে তুমি...।'

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম! তাহলে এতদিন কীসের ভয় পেয়ে এসেছি...!

হঠাৎ করে প্রতাপের মুখটা মনে পড়ল। বড়ো কষ্ট হল ওর জন্য। বাড়িতে ফিরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করব নিশ্চয়ই...

কিন্তু ও কি বুঝবে...?

ত্রাহি মধুসূদন

১

স্নেহের মধুসূদন,

যখন তুমি এই চিঠি পাবে, তখন আমি আর এই ধরাধামে থাকব না। প্রাণ আর দেহ তো মৃত্যুর সঙ্গেই যাবে, তাই দেহের যন্ত্রণা কিংবা মনোকষ্টের ভয় নেই। কিন্তু যা যাবে না, তা নিয়েই ভয়! অর্থাৎ যে অতুল সম্পত্তি মৃত্যুর পর রেখে যাচ্ছি তা সঠিক হাতে পড়ল কি না, তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা লেগেই রইল। জানি তোমার বাস্তব বুদ্ধিটা কাঁচা, আর হাবভাব বড়ো বেশি এঁচোড়ে পাকা! কাব্যি করতে, ভাষণ দিতে বেশ ভালোই শিখেছ। কিন্তু দায়িত্ব নিতে শেখোনি। তাই একটা ছোট্ট পরীক্ষার সামনে ফেললাম তোমাকে।

আমার বাড়িতে একটা অতি মূল্যবান জিনিস আছে। সেই জিনিসটি আমি অন্য একজনের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিলাম! তুমি যদি সেই জিনিসটাকে খুঁজে তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে পারো তবে বুঝব, তুমি আমার উপযুক্ত ওয়ারিশ। আমার মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেই জিনিসটাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমার সম্পত্তি তুমিই পাবে। আর যদি না পারো, তবে উইল মোতাবেক আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি একটি অনাথ আশ্রম পাবে।

জানি তুমি ভাববে, কোনও বাবা কি তার সন্তানকে বঞ্চিত করতে পারে? মনের দুঃখে হয়তো ফের কবিতা লিখতে বসে যাবে। কিন্তু তাতেও তোমার অদৃষ্ট পালটাবে না! জিনিসটা যদি খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দিতে পারো তবে ভালো, নয়তো নিজের অন্নসংস্থান নিজেই করে নিয়ো।

ইতি তোমার বাবা
যশোদাচরণ মুখোপাধ্যায়।

চিঠিটা পড়া শেষ করে অধিরাজের শৈশবের বন্ধু, তথা বর্তমানকালের জনপ্রিয় তরুণ কবি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কাঁচুমাচু মুখ করে বলে— 'কিছুই বুঝতে পারছি না রে। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। বাবা আমার কবিতা লেখা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না ঠিকই... কিন্তু...!'

'তাই বলে এমন একটা আছোলা বাঁশ দিয়ে যাবেন?' পলাপিসি চটে গেছেন—

'যাই বল, তোর বাবার নির্ঘাৎ তোর ওপর জন্ম থেকেই রাগ ছিল। নয়তো এইটুকু হালফিলের ছেলের নাম কেউ ম-ধু-সূ-দ-ন রাখে? এমন একটা ঝকঝকে তকতকে স্মার্ট ছেলে, তার নাম কি না মধুসূদন! আর যার নাম মধুসূদন সে কবিতা লিখবে না তো কি হিসেবের খাতা লিখবে? অবশ্য ভদ্রলোকের নিজের নামটাই বা কী ভালো? যশোদাচরণ! লিখে নে মধু, তোর ঠাকুরদা এমন বদখত নাম দিয়েছিলেন বলেই তোর বাবার রাগ ছিল! আর সেই রিভেঞ্জটাই নিয়েছেন তোর নামের ওপরে!'

ফরেনসিক এক্সপার্ট ড. অসীম চ্যাটার্জি ফিক করে হেসে ফেললেন। অধিরাজের মুখেও মুচকি হাসি। অর্ণব এরকম গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিতে হাসা উচিত কি না ভাবছে। পলাপিসি যতই মধুসূদনের স্বর্গীয় পিতার ওপর চটে লাল হন, ভদ্রলোকের চ্যালেঞ্জটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না! একেই 'মূল্যবান' জিনিসটা কী জাতীয় পদার্থ তার বিন্দুমাত্র উল্লেখও করেননি তিনি। ওদিকে শিয়রে শমন।

'এখন কী করবি ভূতুরাজা?' পলাপিসি উদ্‌বিগ্ন স্বরে বললেন— 'মধু বেচারা কোটিপতি বাপের ছেলে হয়েও শেষে হা-ঘরে হয়ে যাবে?'

অধিরাজ চুপ করে কী যেন ভাবছিল। মুখ তুলে বলল— 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক-ঘণ্টা হাতে আছে মধু?'

মধুসূদন বেচারি ঢোঁক গিলে বলে— 'আর আধ ঘণ্টা! কাল দুপুর বারোটায় বাবার অন্তিম কাজ হয়। একটা নাগাদ ওনার উকিল এসে আমার হাতে চিঠি আর উইল ধরিয়ে দিলেন। আর আজ বারোটায় ফের আসবেন আমি শর্ত পূরণ করেছি কিনা দেখতে...!'

'মা-নে!' পলাপিসির ভ্রূকুটি আরও ভয়ানক হল। তিনি মধুর বাবার ওপর থেকে রাগটা উইথড্র করে এবার মধুর ওপর চটলেন— 'কাল দুপুর একটার সময়ে এত কাণ্ড ঘটল, আর তুই এখন বলছিস! এখন সাড়ে এগারোটা বাজে! তোর বাড়ি যেতে যেতেই পনেরো মিনিট কেটে যাবে। বাকি পনেরো মিনিটে ভূতুরাজা কোন বাঘটা মারবে? কাল থেকে এতক্ষণ কী রাজকার্য করছিলি শুনি?' রাগের চোটে পলাপিসির চশমা খসে পড়ল— 'ওঃ ঈশ্বর! এখন কী হবে! ত্রাহি মধুসূদন!'

বেচারি মধু হতাশভাবে উশকোখুশকো চুলে হাত বোলায়। শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল—'কবিতা লিখছিলাম'।

পলাপিসি কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন— 'তোর বাবা হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দেখছি ঠিক কাজই করেছেন! তুই খাতা, কলম নিয়ে হিমালয়ে যা ভাই। আমরা তোকে মিস করতে রাজি আছি।'

অধিরাজ হেসে ফেলল— 'পিসি, মিনিটে মিনিটে সিদ্ধান্ত বদলানো বন্ধ করো। বেচারি এমনিতেই টেনশনে আছে। তুমি আরও ওকে নার্ভাস করে দিচ্ছ।'

পলাপিসি বিরক্ত হয়ে বললেন— 'নয়তো কী করব? হাতে মাত্র আধঘণ্টা। মূল্যবান পদার্থটা কী— তাও জানা নেই। কী করে খুঁজবি?'

সে মৃদু হাসল— 'দেখা যাক কী হয়। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।'

'তুই একা পারবি? না আমিও...!'

পলাপিসির অন্তরের ইচ্ছে বুঝে হেসে ফেলে অধিরাজ— 'তুমিও চলো, ড. চ্যাটার্জি... ফরেনসিক কিট নিয়ে রেডি হতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

'পাঁচ মিনিট...'।

'ডক্টর, হাতে বিশেষ সময় নেই। মধুর বাড়ি পৌঁছোতে বড়োজোর মিনিট দশ-পনেরো লাগবে। তার মধ্যে চিঠিটা একটু পরীক্ষা করে দেখুন তো, যদি কিছু পাওয়া যায়। সম্ভব হলে দেখার চেষ্টা করুন যে চিঠিটা কত পুরোনো। কাকু ঠিক কবে চিঠিটা লিখেছেন জানা দরকার। কুইক।'

'ওকে'।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ কথা না বাড়িয়ে গাড়ির ব্যাক সিটেই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে পড়লেন! অর্ণব ভয়ে ভয়ে সরে বসে। ড. চ্যাটার্জিকে বিশ্বাস নেই। কখন ফট করে কোন কেমিক্যাল গায়ে ছিটিয়ে দেবেন কে জানে!

পলাপিসির কলকাতার বাড়ির ঠিক পাশেই থাকে মধু-রা। আজ সকালেই তার সমস্যার কথা জেনে সিআইডি ব্যুরোয় হানা দিয়েছিলেন পলাপিসি। আশা ছিল, তাঁর আদরের একমাত্র ভাইপো সিআইডি অফিসার, অধিরাজ ওরফে 'ভূতুরাজা' তুড়ি মেরে প্রবলেম সলভ করবে। কিন্তু এখন তাঁরও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। হতভাগা মধুসূদনটা আর-একটু আগে কথাটা বলতে পারল না! অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা হাতে থাকলে তবু হত। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটে কী হবে? তাঁর মুখে চিন্তার রেখা প্রকট!

অথচ অধিরাজের মুখ দেখে বোঝা দায় তার মনের গভীরে কী চলছে। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানতে চায়— 'আচ্ছা মধু, কাকুর কী সব মূর্তি-টুর্তি সংগ্রহ করার শখ ছিল না?'

'উনি নানারকমের কৃষ্ণের মূর্তি কালেক্ট করতেন। শেষ কয়েক বছর তো শুধু একের-পর-এক ভাস্কর্যই সংগ্রহ করে গেছেন।' মধু আমতা আমতা করে বলে— 'এক-একটা কৃষ্ণের মূর্তির বিশাল দাম! নীলাম থেকে চড়া দামে কিনতেন।'

'হুঁ, আর-একটা কথা বল'। অধিরাজ আপনমনে কিছুক্ষণ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল— 'উকিল সাহেবের কাছে কি সেকেন্ড উইলটা আছে?'

'সেকেন্ড উইল? না তো! কেন?' সে একটু অবাক হয়।

'কাকু যে শর্ত দিয়েছেন, তা যদি তুই পূরণ করে ফেলিস, আই মিন— যদি জিনিসটা তার আসল মালিককে ফিরিয়ে দিস, তবে তো এই উইল নাকচ হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে প্রথম উইলটাকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য একটা দ্বিতীয় উইল দরকার। সেটা কোথায়?'

'সেটা নেই'। পলাপিসি বিরক্ত হয়ে বললেন— 'ওর বাবা ছেলের বুদ্ধির দৌড়

ভালোই জানতেন। ওর দ্বারা হবে না বুঝেই কষ্ট করে সেকেন্ড উইলটা আর করেননি।'

'ওঃ!' অধিরাজ ছোট্ট করে বকা দেয়— 'পলাপিসি... প্লিজ! ওর ব্লাডপ্রেশার আর বাড়িয়ো না।'

'হুম!' পলা পিসি গাল ফুলিয়েছেন। অর্থাৎ অভিমান হয়েছে। অধিরাজ পাত্তা না দিয়ে এবার ড. চ্যাটার্জির দিকে তাকায়— 'ডক্টর, কতদূর?'

ড. চ্যাটার্জি মুখ তুললেন— 'হ্যাঁ রাজা, তোমার প্রশ্নের জবাবই খুঁজছিলাম। চিঠিটা অন্তত দু থেকে আড়াই বছর আগে লেখা। পেনের কালি, আর কাগজ তাই বলছে।'

'দু-বছর আগে তোর মা, মানে কাকিমা মারা গিয়েছিলেন না মধু?'

'হ্যাঁ'। মধু বিষণ্ণ বদনে মাথা নাড়ায়— 'মা ঠিক দু-বছর আগেই গত হয়েছিলেন। বাবা তারপর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেলেন। বেশ কিছুদিনের জন্য গুজরাট ভ্রমণে চলে গেলেন! দ্বারকায় ছিলেন বেশ কয়েক মাস। কৃষ্ণভক্ত ছিলেন কিনা!'

'যতদূর জানি তোর জন্মও গুজরাটেই হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ'। সে জানায়— 'বাবা তখন বিজনেসের কাজে গুজরাটেই বেশি থাকতেন। আমার জন্মের পরে অবশ্য কলকাতায় সেটলড হন।'

'গুজরাট!' ড. চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— 'রাজা, যে কাগজে চিঠিটা লেখা হয়েছে সেটা সম্ভবত গুজরাটেরই। এটা রেইনবো পেপার্স-এর প্রোডাক্ট। রেইনবো পেপার্স-এর কোনও অফিস কলকাতায় নেই। কলকাতায় এই ব্র্যান্ডের কাগজ পাওয়া যায় না। এর মেইন অফিস গুজরাটের আহমেদাবাদে। এটা নিঃসন্দেহে গুজরাটেরই কাগজ।'

'গ্রেট!' অধিরাজ প্রশংসাসূচক মাথা নাড়ায়— 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ'। তিনি বললেন— 'চিঠিটায় সামান্য ড্রাইং অয়েল, রেজিন আর টার্পেনটাইনের ট্রেস আছে। শুধু ড্রাইং অয়েল, বা শুধু টার্পেনটাইন থাকলে হয়তো অন্য কিছু ভাবতাম। কিন্তু যেহেতু এই তিনটে জিনিস একসঙ্গে মিলেমিশে আছে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে জিনিসটার ট্রেস চিঠিটায় আছে সেটা আদতে ভার্নিশ বা বার্নিশ।'

'ফ্যান্টাস্টিক'!

মধুদের বাড়ি এসে গিয়েছিল। অধিরাজ গাড়ি পার্ক করতে করতে বলল— 'জিনিয়াস বলি কী সাধে? ডক্টর, এই মুহূর্তে আপনাকে একটা চিরুনি গিফট করতে ইচ্ছে করছে!'

ড. চ্যাটার্জি বিষম খেলেন। পলাপিসি এতক্ষণ মুখ ফুলিয়ে বসেছিলেন। এবার ফিক করে হেসে ফেললেন!

'হাসছ কী? নামো! এসে গেছি।'

পলাপিসি শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে হাতখোঁপা ঠিকঠাক করছেন— 'মিষ্টি করে বল। তবেই নামব।'

২

বাড়ি বানিয়েছিলেন বটে মধুসূদনের বাবা! এ তো বাড়ি নয়, রাজবাড়ি! সামনে বিরাট বাগান! বাগানে এক বয়স্ক মালি ফুলগাছে জল দিচ্ছিল। অধিরাজ তাকে কয়েক মুহূর্ত দেখল। তারপর কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে— 'নতুন নাকি? নিতাইকাকু কোথায়?'

'নিতাইকাকু বছর পাঁচেক আগেই মারা গেছে। তারপর থেকেই বসুকাকু। আগে বাবার অফিসে পিয়োনের কাজ করত। রিটায়ার করার পর এ বাড়ির স্থায়ী সদস্য হয়ে গেছে। বসুদেব পরমার! রাজস্থানি! বাংলা বোঝে। কিন্তু বলতে পারে না। পুরোনো লোকদের মধ্যে এখন শুধু গৌরদা আর লক্ষ্মীদিই আছে। বাকিরা সব নতুন।'

ড. চ্যাটার্জি গলা খাঁকারি দিলেন— 'আচ্ছা, এ বাড়িতে কি সব দেবদেবীরাই বাস করেন? যশোদাচরণের পুত্র মধুসূদন, তবু বুঝি! কিন্তু গৌর-নিতাই, বসুদেব-লক্ষ্মী— সকলেই দেখছি হাজির! এখানেই শেষ? না আরও আছে?'

'আরও আছে'। মধু জানায়— 'আসলে বাবা নিজে সবার নাম রাখতেন। উদ্ভট স্বভাব বলতে পারেন। করালিদা, গিরিধারীদা, ভারতীদিও আছে লিস্টে!'

'আপনি বাড়িটার নাম দেখেননি ড. চট্টোরাজ?' পলাপিসি বললেন— 'বাড়িটার নাম গোবিন্দ নিবাস!'

ড. চ্যাটার্জি কোনওমতে বললেন— 'ত্রাহি মধুসূদন!'

অধিরাজ এগিয়ে যায়। পেছন পেছন ওরা সবাই। বসুদেব পরমার কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অধিরাজ মৃদু হেসে হাত তুলে নমস্কার জানাল— 'খম্মা গনি'।

বসুদেবও হাতজোড় করেছে। অপ্রতিভভাবে হেসে বলল— 'নমস্তে'।

'আওয়াতা, জয় শ্রীকৃষ্ণ'। সে কথাটা ছুড়ে দিয়েই গটগট করে এগিয়ে যায়। পেছন থেকে বসুদেব প্রত্যুত্তর দেয়— 'জয় শ্রীকৃষ্ণ। আভজো'।

বাগানটাকে পেছনে ফেলে এবার ওরা ভেতরে ঢুকল। গ্র্যানাইটে, মার্বেলে, ঝাড়বাতির বৈভবে ঝলমল করছে ঘরগুলো। দেখলেই বোঝা যায় যে অপরিমিত অর্থ ও পরিমিত রুচিবোধের সংগমে সাজানো হয়েছে প্রত্যেকটা ঘর।

'দশ মিনিট'। পেছন থেকে পলাপিসির আওয়াজ। অর্ণব উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজতে দশ! মধু তখন রীতিমতো ঘামছে। কোনওমতে মুখ মুছে বলল— 'কোথা থেকে শুরু করবি রাজা?'

অধিরাজ চতুর্দিকটা একবার ভালো করে দেখে নেয়। শান্তগলায় বলে— 'কাকু মূর্তিগুলোকে কোন ঘরে যেন রাখতেন?'

'হলঘরে। আয়'।

হলঘরে ঢুকে অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ! কী সর্বনাশ! করেছেন কী মধুসূদনের পিতৃদেব! চতুর্দিকে শুধু কৃষ্ণের মূর্তি! কখনও রাধার সঙ্গে রাধারমণ! কখনও যশোদার সঙ্গে মাখনচোর! কখনও আঙুলে পর্বত তুলে নিয়ে গিরিধারী! কোনওটা কাঠের,

কোনওটা মার্বেলের! যেদিকেই তাকাও শুধু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ!

অধিরাজের চোখে এবার একটা অদ্ভুত আবেশ ঘনিয়ে এসেছে। সে যেন অদ্ভুত ঘোরে ডুবে গেল। চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে মূর্তিগুলো দেখছে। তার দু-চোখ উৎসুকভাবে কী যেন খুঁজছে! আরও চারটে লোক যে পেছনেই 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে খেয়ালই নেই!

— 'দামি জিনিস এই মূর্তিগুলোই'। ফিশফিশ করে বললেন পলাপিসি। ঘড়ির দিকে ইশারা করে দেখালেন, আর সাত মিনিট বাকি! চরম উত্তেজনায় বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে চলেছেন— 'ঠাকুর, মুখ রেখো... ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!'

অর্ণবের মনে হল তার বুকের ভেতরে এই মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডটা নেই। বরং সেখানে কেউ একটা মস্ত ঘড়ি ফিট করে দিয়েছে! তার বুক কাঁপিয়ে ঘড়িটা চলা শুরু করল... টিক...টক...টিক...টক...!

অধিরাজের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সে অন্যমনস্ক স্বরে বলে— ওই মূর্তিটা অমন কেন?'

— 'কোন মূর্তি?' অধৈর্য স্বরে বলল মধু— 'কোনটার কথা বলছিস?'

— ওই মূর্তিটা'।

তার অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ করে সবাই সবিস্ময়ে যশোদা ও মাখনচোরের কাঠের মূর্তিটার দিকে তাকায়। যশোদা আপনমনেই সামনের হাঁড়িতে ননি তৈরি করতে ব্যস্ত! তার পেছন থেকে উঁকি মারছে দুষ্টু মিষ্টি বালগোপালের মুখ! কোনও অস্বাভাবিকতাই নেই!

'যশোদার সামনে দুটো হাঁড়ি কেন?' আপনমনেই বিড়বিড় করে অধিরাজ।

'শিল্পীর ইচ্ছে হয়েছে, দুটো হাঁড়ি দিয়ে দিয়েছেন!' পলাপিসির মন্তব্য— 'তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হল?'

'গোটা মহাভারতই অশুদ্ধ হল!' সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে— 'নীচের হাঁড়িটা আসল। কিন্তু ওপরের হাঁড়িটা পরে বসানো হয়েছে! টিভিতে সিরিয়ালে দেখনি, যখন যশোদা বা অন্য কেউ ননি তৈরি করেন, তখন সামনে একটা হাঁড়িই থাকে! একটার ঘাড়ের ওপর আর-একটা বসানো থাকে না! এমন মারাত্মক ভুল কোনও শিল্পী করবে না। ড. চ্যাটার্জি বলেছিলেন না বার্নিশের ট্রেস আছে চিঠিতে? কাকু স্বয়ং এই হাঁড়িটা বসিয়ে বার্নিশ করে দিয়েছেন, যাতে বোঝা না যায়, ওটা আর্টিফিশিয়াল! ওর ভেতরে কিছু আছে!' সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় মূর্তিটার দিকে। বাকিরা স্তম্ভিতের মতো দেখল ওপরের হাঁড়িটার ভেতরে সে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে।

— 'ওর মধ্যেই আছে দামি জিনিসটা!' উত্তেজনায় পলাপিসি অর্ণবের হাত চেপে ধরে খিমচে দিলেন। অর্ণবের অবশ্য সেদিকে খেয়ালই নেই! সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল হাঁড়ির ভেতর থেকে অধিরাজ বের করে এনেছে একটা কাগজের তোড়া!

— 'এটা!' বিস্ময়াভিভূত স্বরে বলে মধু— 'এইটা দামি জিনিস?'

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অধিরাজ ঘড়ির দিকে তাকায়— 'আর দু-মিনিট! মধু দৌড়ে যা! তোর বসুদেবকাকুকে ডেকে আন।'

মধু বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে গেল বাগানের দিকে। অর্ণব, পলাপিসি, ড. চ্যাটার্জির তখন করুণ দশা! ব্যাপারটা যে কী হচ্ছে কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না! মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যেই অবশ্য বসুদেব পরমারকে নিয়ে এল মধু। সে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। ফরসা মুখ লাল। বসুদেব পরমার প্রথমে অবশ্য কিছুই বুঝতে পারেনি। সে একবার অধিরাজের দিকে তাকাল। তারপর তার হাতের কাগজটা দেখেই তারও মুখের রেখা কেঁপে ওঠে!

— 'আসুন!' কাগজটায় আলতো চোখ বোলাল অধিরাজ— 'এই তো, যা ভেবেছিলাম! দ্বিতীয় ও শেষ উইলটা। সবাই মন দিয়ে শুনুন!'

'আমি শ্রীযুক্ত যশোদাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা ১৯ নম্বর মহিম ঘোষাল স্ট্রিট, কালীঘাট, কলিকাতা— ৭০০০০২৬ অদ্য, ১৫ই নভেম্বর ২০১২, সুস্থ দেহে ও সজ্ঞানে দুইজন সাক্ষীসমেত মদীয় ভবনে আমার উইলপত্র করিতেছি।

আমার অবর্তমানে আমার একমাত্র পালিতপুত্র শ্রীমান মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, ওরফে সুশান্ত ভগ আমার সমস্ত স্থাবর যথা কলিকাতার তিনটি বাড়ি, গুজরাটের দুটি বাড়ি ও অস্থাবর যথা সমস্ত ব্যাংক ব্যালান্স, সোনার গহনা, সার্টিফিকেট, শেয়ার ইত্যাদি এবং আমার ব্যবসায়টির, মেসার্স গোবিন্দ স্পিনিং মিল, টেক্সটাইলস ইত্যাদির মালিকানা অর্জন করিবে।...

মধু থরথর করে কেঁপে ওঠে— 'সুশান্ত ভগ!... পালিতপুত্র! এসব কী! এসবের মানে কী রাজা!'

অধিরাজ একবার বিমূঢ় দর্শকবৃন্দের দিকে তাকায়। তারপর আলতো করে মধুর কাঁধে হাত রাখে। গাঢ় স্বরে বলে— 'বাস্তবটা একটু কঠিন মধু। কিন্তু কাকু যে দামি জিনিসটির কথা বলেছেন, সেটা আর কেউ নয়, স্বয়ং তুই। আর যাঁকে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন তিনি এই দাঁড়িয়ে আছেন। তোর আসল বাবা। বসুদেব পরমার, ওরফে...।'

'শশীভাই ভগ'।

বসুদেব সজোরে কেঁদে ওঠে। হিন্দিতে কোনওমতে যা বলে তার অর্থ অনেকটা এইরকম।

দেড় মাসের শিশু সুশান্তকে ফেলে তার মা লীলাবেন যখন মারা যায় তখন অথৈ জলে পড়েছিল শশীভাই ভগ। শিশুটিকে প্রতিপালনের ক্ষমতা তার ছিল না। এমনিতে আহমেদাবাদে অস্থায়ী মজুরের কাজ করে সে সংসার চালাত। কিন্তু তখন হাতে কাজ ছিল না! ঘরে অন্ন ছিল না! এমন পরিস্থিতিতে শিশুটিকে নিরুপায় হয়ে অল্প টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল সে! এক নিঃসন্তান দম্পতি শিশুটিকে কিনে নিয়েছিলেন। কর্তার নাম— যশোদাচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি রীতিমতো আইনি পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে শিশুপুত্রটিকে দত্তক নেন। কিন্তু পালিত পুত্রের পিতাকেও ছাড়লেন না। তাকে নিজের

গুজরাটের ফ্যাক্টরিতেই কাজ দেন। পরবর্তীকালে কী মনে করে তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। সেই প্রথম নিজের ছেলের মুখ দেখল শশীভাই। তার পিতার প্রাণ আনচান করে ওঠে। কিন্তু বেইমানি করতে পারে না। কর্তা বলেছিলেন— 'তোর কষ্ট বুঝি। কিন্তু সন্তানের লোভ প্রবল রে! আমি বেঁচে থাকতে ওকে এতবড়ো অপ্রিয় সত্যটা বলতে পারব না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমার মৃত্যুর পর ও সব জানতে পারবে। বাকিটা শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছে!' বলতে বলতেই ফের হা-হা করে কেঁদে উঠল বসুদেব, ওরফে শশীভাই ভগ! মধু তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে!

৩

'তুই কখন বুঝলি যে দামি জিনিসটা আসলে মধু নিজেই?'

অধিরাজ স্মিত হাসল। তারা এখন পলাপিসির বাড়িতে বসে আছে। মধু এখনও ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। তাকে কিছুক্ষণের জন্য একা ছেড়ে চলে এসেছে ওরা। আপাতত পলাপিসির হাতের বিখ্যাত মিক্সড মোগলাই সহযোগে চা চলছে। ড. চ্যাটার্জি মোগলাইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। অর্ণব একদৃষ্টে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে।

'শুরু থেকেই বুঝেছিলাম।' সে হাসছে— 'মধুর বাবা চিঠিতেই ক্লু-টা দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন— 'কোনও বাবা কি তার একমাত্র সন্তানকে বঞ্চিত করতে পারে?' এর উত্তর একটাই। না, পারে না। কিন্তু তিনি করছেন। অতএব তিনি মধুর আসল বাবা নন। তার ওপর তিনি একবারও বলেননি 'মূল্যবান বস্তু' বা 'দামি পদার্থ'। বলেছেন 'জিনিস'। অতএব দামি জিনিসটি কোনও ইট, কাঠ, পাথরের বস্তু নয়। ভাষার মুনশিয়ানাটা লক্ষ করো। একবারও বলেননি 'ফেরত দিতে হবে'। বরং বলেছেন— 'ফিরিয়ে দিতে হবে'। বস্তু 'ফেরত' দেওয়া যায়, কিন্তু পিতৃত্বের অধিকার 'ফেরত' দেওয়া যায় না। 'ফিরিয়ে' দিতে হয়।

'এইটুকুতেই বুঝে গেলি?'

'না, আরও আছে।' সে চায়ের কাপে চুমুক দেয়— 'তুমি ভদ্রলোকের নাম নিয়ে ঠাট্টা করছিলে! কিন্তু ওঁর নামটাই ভাইটাল ক্লু! 'যশোদা'। কীরকম বুদ্ধিমান লোক দেখ! জেনেশুনেই ছেলের নাম রাখলেন 'মধুসূদন'। মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের নাম। মহাভারতের গল্পে শ্রীকৃষ্ণ যশোদার পালিতপুত্র ছিলেন। এই ইঙ্গিতটা জেনেবুঝেই দিয়েছিলেন! আবার অন্যদিকে তাঁর মালির নাম রেখেছেন 'বসুদেব'! কী সাংঘাতিক কানেকশন! বসুদেব 'শ্রীকৃষ্ণের' প্রকৃত পিতা ছিলেন। মানে মধুসূদনের আসল বাবা হলেন বসুদেব। আমি 'বসুদেব' নামটা শুনেই বুঝে গিয়েছিলাম মূল্যবান জিনিসটার মালিক কে! আবার দ্যাখো, চিঠি লিখলেন তো লিখলেন এমন একটা কাগজে, যেটা গুজরাতের! অর্থাৎ মধুর সঙ্গে গুজরাতের কোনও সম্পর্ক আছে! পদে পদে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন আসল ঘটনার!'

'কিন্তু...!' পলাপিসির খটকা যায় না— 'বসুদেবকে তো সবাই রাজস্থানের লোক বলে জানত। তুই কখন বুঝলি যে ও গুজরাতের লোক?'

অধিরাজ মিটমিট করে হাসছে— 'সব মানুষেরই একটা প্রীতি সম্ভাষণ থাকে। তার জবাবও দিতে হয়। যেমন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'আসসালাম ওয়ালেকুম' বললে ওরা উত্তর দেয়— 'ওয়ালেকুম আসসালাম!' যারা জম্মু কাশ্মীরে থাকেন, তারা বেশিরভাগই বলে থাকেন 'জয় মাতা দি' বা 'জয় মাতা কি'। কোনও শিখকে যদি বলা হয় 'যো বোলে সো নিহাল' তাহলে সে উত্তর দেবেই 'শস্ত্রীয়কাল'! 'গণপতি বাপ্পা' জয়ধ্বনি দিলে মারাঠিরা বলবেই 'মো-রি-য়া!' ঠিক এইরকমই একটা শুভ সম্বোধন রাজস্থানিদেরও আছে। 'খম্মা গনি' বললে যে-কোনো রাজস্থানী উত্তর দেবে 'গনি খম্মা'। কিন্তু বসুদেব কথাটা বুঝলই না। 'বসুদেব' নামটা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। তাই ঠিক তারপরই আচমকা গুজরাতি সম্বোধন করলাম 'আওয়াতা, জয় শ্রীকৃষ্ণ'। অর্থাৎ 'আসছি'। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ও অবিকল একজন গুজরাতির মতোই প্রত্যুত্তর দিল— 'জয় শ্রীকৃষ্ণ। আভজো'। অর্থাৎ 'এসো'। আর কোনও গুজরাতিকে 'জয় শ্রীকৃষ্ণ' বললে সেও প্রত্যুত্তরে 'জয় শ্রীকৃষ্ণ' বলবেই! এটাই নিয়ম। বসুদেবও অসাবধানে বলে ফেলেছিল। তার ওপর লোকটার কপালটা দেখেছ? একদম তিনকোনা। দেখলে মুকুটের কথা মনে পড়ে। অনেকে বলে 'মুকুট কপাল'। এই জাতীয় কপালের আকৃতি দুর্লভ। অথচ মধুরও মুকুট কপাল! ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার।'

'কপাল' শব্দটা শুনে ড. চ্যাটার্জি নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। আড়চোখে সেটা লক্ষ করে অধিরাজ বলে— 'হ্যাঁ ডক্টর! আপনার কপালটাও দুর্লভ! মাথাজোড়া কপাল, আই মিন গ্লোব কপাল!'

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হাঁউমাউ করে উঠতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সে— 'অবশ্য ওই কপালের জোরেই এত কম সময়ে সেকেন্ড উইলটা উদ্ধার করতে পেরেছি। গোটা ঘটনাটা বুঝলেও শুধু বুঝতে পারছিলাম না দ্বিতীয় উইলটা কাকু কোথায় রেখেছেন। উকিলের কাছে সেটা ছিল না। তবে কোথায়? ড. চ্যাটার্জি কামাল করলেন বার্নিশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। তখনই বুঝলাম কোনও মূর্তির মধ্যেই লুকোনো আছে সেটা, যেটা ভদ্রলোক চিঠি লেখার আগেই বার্নিশ করে এসেছেন! অতঃপর শ্রীমতী যশোদা দু-খানা হাঁড়িতে ননি বানালেন! এবং কেস সলভড! শেষপর্যন্ত পলাপিসির 'ত্রাহি মধুসূদন' প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া দিলেন!'

পলাপিসি হাঁ করে এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার বললেন— 'আমারও অবশ্য প্রথমেই একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু বলিনি। আসলে...!'

অর্ণব স্পষ্ট শুনল ড. চ্যাটার্জি বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করলেন। ভদ্রলোক বলছেন— 'ত্রা-হি মধুসূদন! মিথ্যে বলারও একটা সীমা থাকে!'

বাকিটা ঈশ্বর

১

অন্যান্যদিনের মতোই 'মা তারা' জুয়েলার্সের কাউন্টারে অসম্ভব ভিড় ছিল। 'মা তারা' জুয়েলার্স এখানকার নামকরা গয়নার দোকান। তার ওপর 'ধনতেরাস'-এ সকলেই সোনা বা রূপো কিনে বাড়িতে লক্ষ্মীকে আনতে চান। ফলস্বরূপ জুয়েলারির দোকানের ভেতরে উপচে পড়ছে ভিড়।

পলাপিসি ভিড়ের মধ্যেই দিব্যি টুকটুক করে এগিয়ে গেছেন কাউন্টারের দিকে। কিন্তু পিসির এই ভিড় অসহ্য লাগছিল! এতগুলো মানুষের গুঁতোগুঁতিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। কেউ ভতাং করে একগুঁতো মেরে দিল! কেউ খটাং হিল পরে পা দিল মাড়িয়ে! প্রচুর ঠ্যালা, ধাক্কা আর গুঁতো খেয়ে শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ওদিকে পলাপিসির গয়না দেখা আর শেষই হয় না!

অনেক দেখে-টেখে পলাপিসি বললেন— 'হুম। বুঝলেন...'!

আরও কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই কোথা থেকে যেন আচমকা চিৎকার ভেসে এল— 'সব গেল! স-ব গে-ল! চো-ও-র! চো-ও-র!'

আচমকা চ্যাঁচামেচিতে ভিড়টা সচকিত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে ভেতরের দিকের দরজা খুলে সাঁ করে বেরিয়ে এল এক মাঝবয়সি লোক! পরনে এই দোকানের ইউনিফর্ম! লোকটা সম্ভবত এই দোকানেরই কর্মচারী। তার পেছন পেছন এক বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসেছেন! চোখদুটো উত্তেজনায় বিস্ফারিত, রক্তাভ! কোনওমতে কষ্ট করে শ্বাস টানতে-টানতে শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন— 'ধরুন ওকে! চো-ও-র! চো-ও-র!'

একরাশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকের মধ্য দিয়েই লোকটা প্রায় কাজ সেরে বেরিয়েই যাচ্ছিল! সিকিউরিটি গার্ডও ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল! আর-একটু হলেই দিব্যি পগার পার হয়ে যেত। কিন্তু যখন কারোর বুদ্ধি কাজ করে না, তখনই পলাপিসি কিছু না কিছু কামাল করেন। কাউন্টারে কাচের টেবিলের ওপরেই একটা রূপোর হাত-আয়না সাজানো ছিল। আচমকা সেটা তুলে নিয়েই সপাটে ছুড়ে মারলেন লোকটার পিঠ লক্ষ করে। একদম অব্যর্থ নিশানা। রূপোর ভারী আয়নাটা ধড়াম করে গিয়ে লাগল লোকটার পিঠে! সেও এই আচমকা আক্রমণ সামলাতে না পেরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়েছে মাটিতে! চোখ থেকে সানগ্লাস, পকেট থেকে মানিব্যাগ, খুচরো পয়সা ঝনঝনিয়ে

ছিটকে পড়ল মাটিতে! নস্যির ডিবেটা ফেটে গেছে। মার্বেলের দামি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল নস্যি!

এতক্ষণে যেন সিকিউরিটির সম্বিত ফেরে। তারা দৌড়ে গেছে লোকটার দিকে। বয়স্ক মানুষটি উত্তেজনার ধাক্কা বোধহয় নিতে পারেননি! হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে স্খলিত দেহে বসে পড়েছেন ওখানে। অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন— 'ও চো-র!'

তারপরই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে!

একটু পরেই পুলিশ এসে হাজির। ততক্ষণে চোরের পরিচয় জানা গেছে। জানা গেছে বৃদ্ধ মানুষটিরও পরিচয়। উনি এই দোকানেরই মালিক—প্রদীপ দত্ত। দোকানের ভেতরেই তাঁর পার্সোনাল কেবিন। তার পাশেই একটা বিরাট ঘরে কর্মচারীরা গয়না ডিজাইন করতে ব্যস্ত। কর্মকারদের মধ্যেই প্রধান এই তথাকথিত 'চোর'! নাম বিরাজ সামন্ত। বহুবছরের কর্মচারী। কর্তার, তথা প্রদীপবাবুর ডানহাত। কিন্তু তাকেই কর্তা এমন অপবাদ দিলেন কেন বোঝা যাচ্ছে না! প্রদীপবাবু অবশ্য আর কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। মেঝেতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে কাছের নার্সিংহোমেই অ্যাডমিট করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের সন্দেহ, একটা ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে তাঁর। অবস্থা সংকটজনক।

'কী চুরি করেছিস?' ইন্সপেক্টর ভারিক্কি চালে বলেন— 'সোজাসুজি বলবি? না ব্যাটনের বাড়ি দেব?'

বিরাজ সামন্ত হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে— 'কিচ্ছু চুরি করিনি স্যার! আপনারা তো আমাকে সার্চ করেও দেখলেন। যদি কিছু চুরি করে থাকি তবে এতক্ষণে কি পেতেন না?'

কথাটা ঠিক। এতক্ষণে পুলিশকর্মীরা অন্তত প্রায় পঞ্চাশবার তার দেহ তল্লাশি করে ফেলেছে। কিন্তু একখানা তিন টাকার জেল পেন, সবুজ কাচের সস্তা সানগ্লাস, গোটা কয়েক নোট, খুচরো পয়সা, ভাঙা নস্যির ডিবে, আর একটা রুমাল ছাড়া কিছুই পায়নি। লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে গেছে। যদি সত্যিই কিছু চুরি করে থাকে তবে লুকোনোর সময়ই পায়নি! এই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে চোরাই জিনিস সে পাচার করল কোথায়?

'তবে উনি চোর-চোর বলছিলেন কেন? ওঁর কেবিনে তো প্রচুর দামি দামি হিরে থাকত!' ভ্রূকুটি করে বললেন ইন্সপেক্টর— 'গিলে ফেলিসনি তো?'

'বলেন কী!' লোকটা আঁতকে ওঠে— 'হিরে গিলে ফেললে কি আমি আপনার সামনে আস্ত দাঁড়িয়ে থাকতাম স্যার? এতক্ষণে ওপরের টিকিট কাটা হয়ে যেত।'

একটা বিরাট 'হুম্মম' করে ইন্সপেক্টর বললেন— 'ঠিক আছে। দেখা যাক। প্রদীপবাবুর পার্টনার, মানে ওঁর বড়ো ছেলে কেবিনের সব কিছু মিলিয়ে দেখছেন। উনি বেরিয়ে এলেই বোঝা যাবে'।

ফের মিনিট দশেকের অসহ্য প্রতীক্ষা! যত ক্রেতা উপস্থিত ছিল, সবাই রুদ্ধশ্বাসে

অপেক্ষা করছে পরিণতি দেখার জন্য। বিরাজ সামন্ত কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। ইন্সপেক্টর মাঝে মাঝে অগ্নিদৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছেন তাকে...!

'অফিসার'। প্রদীপ দত্তের পার্টনার, তথা বড়ো ছেলে প্রবীর দত্ত এতক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন। আস্তে আস্তে বললেন— 'যতদূর জানি বাবার ঘরের সিন্দুকে লাখ দুয়েক টাকা ক্যাশ ছিল, বেশ কিছু সোনার গিনি ছিল, আজ সকালে ইম্পর্ট্যান্ট কাস্টমারদের তিনটে হিরের এক্সক্লুসিভ নেকলেস ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। ইনফ্যাক্ট, বিরাজেরই একটা হার আজ সকালে ডেলিভারি দেওয়ার ছিল। সেগুলোও সিন্দুকে থাকার কথা'।

ভদ্রলোকের মন্থরভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে ইন্সপেক্টর বলেন— 'সেগুলো কি নেই?'

'আজ্ঞে না!' বিস্ময় ছলকে পড়ল প্রবীরের কণ্ঠে— 'সবই আছে। কিচ্ছু খোয়া যায়নি! হিরে তো দূর, একটা নোটও চুরি হয়নি!'

ইন্সপেক্টরের চোয়াল ঝুলে পড়ে। বিরাজ সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তবে তুই কী চুরি করলি!'

২

'বলেছিলাম না?' গরম গরম মাশরুম-বাটার পকোড়া খেতে খেতে বললেন পিসো— 'পলা আর প্রবলেমের ভালোবাসার সম্পর্ক ভাইস-ভার্সা! দিঘা হোক কী কলকাতা, পলা ঠিক ঝামেলায় জড়াবেই'।

অধিরাজ যথারীতি পলাপিসির মুখে সব ঘটনা শুনেছে। পলা অগ্নিদৃষ্টিতে পিসোকে চিংড়িপোকা করে দিয়ে বললেন— 'সত্যি রে! লোকটা কী চুরি করল বল তো! আমার মনে হয় 'বিরাজের মালিকের বড়ো ছেলের সঙ্গে ষড় আছে। কিছু একটা চুরি করেছে তো বটেই। কিন্তু বড়ো ছেলেটা ব্যাটাকে বাঁচাচ্ছে'।

'হতে পারে। লোকটা, আই মিন, বিরাজবাবুকে পুলিশ কি ছেড়ে দিয়েছে?'

'না, এখনও হেফাজতে রেখেছে। যতক্ষণ না প্রদীপবাবুর জ্ঞান ফিরছে, ততক্ষণ পুলিশি হেফাজতে থাকবে'।

'কিন্তু সত্যিই যদি কিছু চুরি করে থাকে তবে চোরাই মাল গেল কোথায়?'

'ইয়ে, হয়তো দোকানেই কোথাও লুকিয়েছে'।

'ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ডের মধ্যে? কোথায় লুকোবে?'

পলাপিসির চোখ চকচক করে ওঠে— 'ব্যোমকেশ বকসির একটা গল্পে পড়েছিলাম এক জহুরির নেকলেস তার চাকর চুরি করে মেইলবক্সে রেখেছিল! এখানেও একটা মেইলবক্স আছে রে ভূতুরাজা! দোকানের ঠিক বাইরেই...!'

'কিন্তু লোকটা দোকানের বাইরে এল কখন?' অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসে— 'তুমি তো তার আগেই ব্যাটাকে আয়নার গুঁতোয় ফ্ল্যাট করে দিলে! ওঃ পিসি! তুমি যে কেন শুটিংটা শিখলে না! অথবা তির-ধনুক! তাহলে ইন্ডিয়া অলিম্পিকে অন্তত প্রতিবছর

একটা করে সোনা পেতই! '

'হাসছিস হাস!' পলা মুখ ফুলিয়েছেন— 'কিন্তু আমার দৃঢ় সন্দেহ, ওই মেইলবক্সেই চোরাই জিনিসটা আছে'।

অধিরাজ শান্ত দৃষ্টিতে তাকায়। আজ তার ছুটি। সে ছুটি কাটাতেই পলাপিসির বাড়ি এসেছিল। কিন্তু সমস্যাটা তার মস্তিষ্কের ধূসর কোশকে বেশ চাঙ্গা করে দিয়েছে। সে একটু ভেবে বলে— 'চলো, বলেছ যখন তখন একটু চেক করে দেখাই যাক'।

পলাপিসি প্রায় নেচে উঠে বললেন— 'চল'।

সকালের অত কাণ্ডতেও কিন্তু মা তারা জুয়েলার্সের কর্মপ্রবাহ প্রতিহত হয়নি। বরং দুপুরেও জমজমাট ভিড়। অধিরাজের পরিচয় পেয়ে প্রবীর দত্ত রীতিমতো খাতির করেই সটান নিয়ে গেলেন কেবিনে। বাবার সিন্দুকটা খুলে দিয়ে বললেন— 'এই দেখুন, সবই এর মধ্যে রয়েছে। ক্যাশ, জুয়েলারি, গিনি মিলিয়ে প্রায় নব্বই লাখ টাকার জিনিস। একটা আঁচড়ও পড়েনি।'

'এ ছাড়া অন্য কিছু দামি জিনিস আপনার বাবার সিন্দুকে ছিল না তো?'

ভদ্রলোক ফের হাসলেন— 'যদি থাকত তবে আমি জানতাম না? তা ছাড়া এই দেখুন, বাবার নোটবুক। প্রতিদিন সকালে উনি লিস্ট করে রাখতেন যে সিন্দুকে কী কী আছে। কী ডেলিভারি যাবে, কী আসবে। আমি সেই লিস্ট মিলিয়েই দেখেছি'।

অধিরাজ আলতো করে একবার চোখ বোলায় নোটবুকের পাতায়। সত্যিই ভদ্রলোক সব কিছু লিখে রাখেন। সিন্দুকে কী কী আছে, কোন জিনিস কখন ডেলিভারি যাবে, কোন অর্ডার এসে পৌঁছোবে— এমনকি টাকার লেনদেনগুলোও স্পষ্ট লিখে রেখেছেন। সে অন্যমনস্কভাবে পাতা ওলটাতে থাকে। লেখার ওপরে চোখ বোলাতে বোলাতেই আচমকা থমকে গেল সে। কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়— 'শীলা কে?'

'শীলা?' এইবার প্রবীরবাবুও অবাক— 'শীলা আমার ছোটো বোনের মেয়ের নাম! কেন?'

'এই দেখুন'। অধিরাজ নোটবুকটা এগিয়ে দেয়। প্রবীর অবাক হয়ে দেখলেন নোটবুকটায় 'শীলা' নামের পাশে একটা বিরাট টাকার অঙ্ক লেখা আছে। ইউ এস ডলারের হিসেবকে ভারতীয় মুদ্রায় পরিণত করে রেখেছেন প্রদীপ দত্ত। অঙ্কটা নেহাত কম নয়! ভারতীয় মুদ্রায় পুরো সাত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে শীলাকে।

'সা-ত কো-টি!' প্রবীরবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। তারপর রুমালে মুখ মুছে বললেন— 'আ-আমি এসব কিছু তো জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনার বাবা আপনার ভাগ্নিকে সাত কোটি টাকা দিয়ে দিলেন, আর আপনি কিছুই জানেন না?'

'স্যা-র!' তার মুখ ফ্যাকাশে— 'সেটা একদম অসম্ভব!'

'কেন?'

'কারণ আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিল শীলা। ওখানেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওর মৃত্যু হয়!' প্রবীরবাবু জানান— 'শীলা বেঁচেই নেই! তাকে টাকা দেবেন কী করে বাবা?'

আর জিজ্ঞাস্য কিছু ছিল না। ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল অধিরাজ। আচমকা থমকে দাঁড়ায়— এই ছবিটা আপনার বাবার নয়?'

টেবিলের ওপর একটা গ্রুপ ফোটোগ্রাফ ছিল। খালি গায়ে চার বৃদ্ধ পোজ মেরে দাঁড়িয়ে হাসছেন! পেছন থেকে একটা ধোঁয়ার আস্তরণ সামান্য আবছা করে দিলেও চারমূর্তিকে দেখতে কষ্ট হয় না। একদম স্পষ্ট প্রদীপবাবু। কাঁধে তোয়ালে, খালি গা, চোখে সানগ্লাস। হারকিউলিসের মতো পোজ মেরে হাসছেন। বাকি তিনজন অচেনা।

'ওঁরা বাবার ক্লাবের বন্ধু ছিলেন।' প্রবীর বিষণ্ণ কণ্ঠে জানান— 'বাবা কোনও কারণে স্ট্রেসড হয়ে পড়লে বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাবে চলে যেতেন। এখন অবশ্য আর যান না। কারণ ওঁর বন্ধুদের মধ্যে দুজন মারা গেছেন। আর একজন বর্তমানে মেয়ের কাছে চলে গেছেন বিদেশে।'

'আরে, ওঁর চশমাটা দ্যাখ রাজা!' পলাপিসি লাফিয়ে ওঠেন— 'এইরকম সবুজ কাচের অদ্ভুত সানগ্লাস ওই বিরাজ লোকটার কাছেও ছিল! প্রদীপবাবুর চশমাটা চুরি করেনি তো ব্যাটা?'

এইবার এত দুঃখেও হেসে ফেললেন প্রবীর— 'না ম্যাডাম। এইরকম সানগ্লাস আমাদের সব কর্মচারীরই আছে। আমারও আছে। বাবাই গিফট করেছেন। কাটিংয়ের কাজ করলে, আগুনের সামনে উপুড় হয়ে থাকলে চোখে আগুনের আঁচ লাগে। তাই এই সানগ্লাসের ব্যবস্থা। বাবার সানগ্লাসটাও আমার কাছেই আছে। এই যে!'

ভদ্রলোক সানগ্লাসটা বের করে দেখালেন। অধিরাজ একবার সানগ্লাসটা নেড়েচেড়ে দেখল। এই সানগ্লাসের দাম বড়োজোর পঞ্চাশ কী একশো টাকা। কলকাতার ফুটপাথে গুচ্ছ গুচ্ছ পাওয়া যায়। সে কটমটিয়ে তাকায় পলা পিসির দিকে। পলা পিসি অপ্রস্তুত। কোনও কথা না বাড়িয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলেন অধিরাজের সঙ্গে।

'মেইলবক্সটা দেখবে?

দোকানের বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করে অধিরাজ। পলা তার কণ্ঠে শ্লেষের সুর স্পষ্ট বুঝেছেন। মাথা নীচু করে বললেন— 'না থাক'।

৩

নার্সিংহোমের আইসিসিইউর ভেতরে দাঁড়িয়েছিল ওরা দুজনে। সামনের বেডেই শুয়ে আছেন প্রদীপ দত্ত। মুখে পেল্লায় অক্সিজেন মাস্ক। চোখদুটো কেউ যেন আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে। ফরসা ধবধবে মানুষটির মুখে অসুস্থতার পিঙ্গল আভা। অধিরাজ একদৃষ্টে কী যেন দেখছে। ভদ্রলোকের নাকের ওপর একটা কালচে অদ্ভুত দাগ। সে চোখ কুঁচকে সেদিকেই তাকায়। কীসের দাগ ওটা? পড়ে গিয়ে চোট লেগে কালশিটে পড়েছে নাকি?

ওদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ড. রায়। আপশোশের সুরে বললেন— 'হার্টটা অত্যন্ত জখম হয়েছে। বারবার বলেছিলাম টেনশন না করতে। স্ট্রেস না নিতে। কথাই শুনতেন না।'

'আচ্ছা ড. রায়...' অধিরাজ একটু ভেবে বলে— 'ওঁর কি কোনও মানসিক রোগ আছে? যেমন হ্যালুসিনেশন, বা ইল্যুশন জাতীয় কিছু?'

'না। ওসব কিছুই ছিল না।' ড. রায় মাথা নাড়লেন— 'ওঁর দেহে একটাই সমস্যা ছিল। টেনশনে মাসলগুলো স্ট্রেসড হয়ে যেত। অনেকবার মারাত্মক মাসল্‌পুলও হয়েছে। পরে অবশ্য স্টিম বাথ নিতে নিতে সে সমস্যা অনেকটাই কমেছিল।'

'তবে কি ওঁর চোখে হাই পাওয়ার আছে? দেখতে পেতেন না ঠিকমতো?'

'একদমই না'। তিনি প্রতিবাদ করেন— 'বরং ঈশ্বরের কৃপায় এই বৃদ্ধ বয়সেও ওঁর চোখে কোনও পাওয়ার নেই! দৃষ্টি একদম পরিষ্কার!'

'ও!' অধিরাজ একটু যেন উত্তেজিত। তবু নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে করতেই বলল— 'কতদিনে সুস্থ হবেন বলতে পারেন?'

'বলা মুশকিল'। ড. রায় জানান— 'বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সেন্স না ফিরলে কিছুই বলা যায় না। অবশ্য আমরা সবরকমভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বাকিটা ঈশ্বর...!'

পলাপিসির কৌতূহলের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়ছিল। অধিরাজের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আরও বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। শেষপর্যন্ত নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে উশখুশ করতে করতে বলেই ফেললেন— 'রাজা, তুই হ্যালুসিনেশন বা ভুল দেখার কথা তুললি কেন?'

অধিরাজ বলে— 'দরকার ছিল। এমনও তো হতে পারে যে আদপে কিছুই চুরি হয়নি। গোটাটাই ভদ্রলোকের ভ্রান্তি। অথবা ভ্রান্ত ধারণা।'

'সত্যিই কি তাই?'

'প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা নয়'।

'সত্যিই চুরি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে'। অধিরাজের চোয়াল শক্ত— 'নয়তো ভদ্রলোক এত বড়ো শক পেতেন না। ভেবে দ্যাখো, এমন জিনিস চুরি গেল যে ভদ্রলোকের হার্ট-অ্যাটাকই হয়ে

গেল! আচ্ছা, আর-একবার গোটা ঘটনাটা শুরু থেকে বলো তো!'

পলা পিসি আর-একবার গোটা ঘটনাটা একেবারে ছবির মতো সাজিয়ে বললেন। খুঁটিনাটি বর্ণনাও বাদ গেল না! পুরো ঘটনাটা শুনে সে এবার আস্তে আস্তে বলল— 'নস্যির কৌটো ভেঙে গিয়েছিল!'

'একদম। পুরো নস্যিতে নস্যিতে ছত্রাকার'। বলতে বলতেই পিসি থেমে গেলেন— 'ভূতুরাজা! তবে কী...?'

'ঠিক ট্র্যাকই ধরেছ'। সে মিটিমিটি হাসছে— 'আগে?'

'কিরীটি রায়ের গল্পে পড়েছিলাম নস্যির কৌটোর মধ্যে একজন এমনই একটা দামি আংটি লুকিয়ে রেখেছিল! এখানেও তাই...!'

অধিরাজ হেসে ফেলে— 'পয়েন্ট আছে। কিন্তু জিনিসটা কী?'

'কী?'

'সবই তো তোমার চোখের সামনেই আছে, তবু বুঝতে পারছ না?'

'না'। তিনি স্তম্ভিত— 'তুই বুঝেছিস?'

'মনে হয়'। সে নিজের ফোনটা বের করতে করতে বলল— 'নিরানব্বই শতাংশ বুঝে গিয়েছি। এক শতাংশ জানলেই গোটা রহস্যটা সাফ হয়ে যাবে'।

'জিনিসটা কোথায় আছে জানিস?'

অধিরাজ মোবাইলের ইন্টারনেটে কী যেন সার্চ করছে— 'লোকটা যেখানে আছে, জিনিসটাও সেখানেই আছে। অর্থাৎ পুলিশের হেফাজতে।'

পলাপিসি গম্ভীর মুখে বললেন— 'হ্যাঁ বুঝেছি। ওই নস্যির কৌটোই হল আসল কালপ্রিট!'

৪

বিরাজ সামন্ত তখনও পুলিশের হেফাজতেই ছিল। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে একই কথা বলে চলেছে— 'আমি কিছু চুরি করিনি স্যার। ছোটোকর্তাও তো বলেছেন, কিছুই চুরি যায়নি।'

ইন্সপেক্টর ভ্রূকুটি করেছেন— 'তবে পালাচ্ছিলি কেন?'

'ভয়ে স্যার'। বিরাজ কাঁচুমাচু মুখ করে— 'বড়োকর্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন নেকলেস নেওয়ার জন্য। ওটা সকালেই ডেলিভারি যাওয়ার কথা। আমি যখন ঢুকলুম তখন উনি ঠাকুরকে ধূপ দিচ্ছিলেন। আচমকা পেছনে ফিরেই কথা নেই বার্তা নেই আমাকে দেখে 'চো-র চো-র! করে চেঁচিয়ে উঠলেন! বলুন, এমন ব্যবহার করলে কোন মানুষ না ভয় পাবে?'

অকাট্য যুক্তি! ইন্সপেক্টর হাল ছেড়ে দেন। লোকটা হয়তো সত্যিই কিছু চুরি করেনি।

আকস্মিকভাবে গরাদের বাইরে থেকে আওয়াজ এল— 'আপনি যেতে পারেন।

কিন্তু জিনিসটা দিয়ে যান।'

বিরাজ ও ইন্সপেক্টর দুজনেই সচকিত হয়ে পেছনে তাকালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুই মূর্তি।

'আপনি?' ইন্সপেক্টরের ভুরুতে ভাঁজ পড়লেও অধিরাজের পরিচয় শুনে সেটা মিলিয়ে গেল। গদগদ কণ্ঠে বললেন— 'আপনি এখানে স্যার!'

'দামি জিনিসটা ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি'। অধিরাজ বিরাজের দিকে তাকিয়েছে— 'দিন! আপনার বুক পকেটেই তো আছে দেখছি জিনিসটা।'

'কী!' বিরাজ স্তম্ভিত— 'নস্যির কৌটো?'

'না না!' সে বিনীত— 'কৌটোটা তো ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু যেটা ভাঙার কথা ছিল, অথচ ভাঙল না সেটার কথাই বলছি। আপনি ফুল ভেলোসিটিতে মেঝেতে আছড়ে পড়লেন। নস্যির পলিথিনের কৌটোটা ভাঙল। আপনার চোখ থেকে ছিটকে পড়ল সানগ্লাস! ওটারও তো ভাঙার কথা ছিল। সামান্য পঞ্চাশ কী একশো টাকার কাচের সানগ্লাসের তো ভাঙারই কথা। কিন্তু ভাঙল না কেন বলুন তো?'

লোকটার গলার হাড় নড়ে উঠল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

'পঞ্চাশ-একশো টাকার সানগ্লাস ভাঙতেই পারে!' অধিরাজ মাথা নাড়ছে— 'কিন্তু পুরো সাত কোটির সানগ্লাসের তো ভাঙার কথাই নয়! প্রদীপবাবুর যে গ্রুপ ফোটোটা সাজানো আছে টেবিলের ওপরে, সেখানে সবার খালি গা, গায়ে তোয়ালে, পেছন থেকে ধোঁয়া আসছে, অর্থাৎ উনি তখন স্টিমবাথ নিচ্ছিলেন। ওঁর ডাক্তারও বলেছে যে উনি স্টিমবাথ নিতেন। কিন্তু স্টিমবাথ নিতে গেলে কোন মূর্খ সানগ্লাস পরে যায়? চশমায় তো ধোঁয়া জমে যাবে তাই না? তা ছাড়া, ওঁর নাকের ওপর একটা স্পষ্ট দাগ আছে। যাদের চোখে খুব পাওয়ার থাকে, তাদের ভারী পাওয়ারের ওজনদার চশমা পরে থাকতে থাকতে ওইরকম দাগ হয়ে যায়। কিন্তু প্রদীপবাবুর চোখে কোনও পাওয়ার ছিল না। তবু নাকে দাগ কেন? তার মানে তিনি অষ্টপ্রহর ওই সানগ্লাসটাই পরে থাকতেন। যে সানগ্লাসটা পরতেন, সেটা ভারী ছিল। এইমুহূর্তে যে সানগ্লাস ওঁর টেবিলে শোভা পাচ্ছে, সেই চশমাটা নয়। কারণ ওই চশমাটা নেহাতই হালকা! কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এই মুহূর্তে যদি আমি আপনার সানগ্লাসটা পরীক্ষা করে দেখি, তবে দেখব সেটা বেশ ভারী।'

'সাত কোটির সানগ্লাস! এই রূপোলি ফ্রেমের সবুজ কাচের চশমার দাম সাত কোটি!' ইন্সপেক্টরের চক্ষু চড়কগাছ— 'বলেন কী?'

'ঠিকই বলছি'। সে মৃদু হাসে— 'প্রদীপবাবুর নোটবুকে লেখা ছিল যে জনৈক 'শীলা'-কে উনি সাত কোটি টাকা দিয়েছেন। দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু শীলাকে নয়। মনে রাখার সুবিধের জন্য উনি ওঁর মৃতা নাতনির নামটা লিখেছিলেন। আসলে টাকাটা গিয়েছিল 'শিলস এমারেল্ড সানগ্লাসের' পেছনে। শিলস এমারেল্ড সানগ্লাস এমন একজোড়া

সানগ্লাসই তৈরি করেছিল। যে ফ্রেমটা রূপোলি মনে হচ্ছে ওটা রোডিয়ামের। এই মুহূর্তে সোনা এমনকি প্ল্যাটিনামের চেয়েও বেশি দামি ধাতু রোডিয়াম। আর ওই ফ্রেমে যে কাচটা দেখছেন, ওটা আদতে কাচই নয়। কলম্বিয়ান পান্না কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বে এই মুহূর্তে এই চশমাটার দাম সাত কোটি টাকা! বা তারও বেশি! সেইজন্যই কখনও প্রদীপবাবু এটাকে হাতছাড়া করতেন না। সবসময়ই তার চোখে থাকত এই সানগ্লাস! তবে ভয় ছিল যে যদি কেউ বুঝে ফ্যালে। তাই কর্মচারীদেরও এই একইরকমের সস্তা দামের সানগ্লাস উপহার দিলেন। কী অদ্ভুত বুদ্ধি। রোডিয়ামের চেহারা একেবারেই সাধারণ! আর কাচের জায়গায় যে পান্না বসানো তা কার মাথায় আসবে? একটা লোক একটা উদ্ভট সানগ্লাস পরে যাচ্ছে দেখলে অতিবড়ো চোরের মাথাতেও আসবে না যে এই সাধারণ দেখতে সানগ্লাস যা এইভাবে একটা মানুষ ওপেনলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটার দাম সাত কোটি টাকা! কিন্তু আপনি বুঝে ফেললেন। এবং সেইদিন যখন ভদ্রলোক পেছন ফিরে ঠাকুর দিচ্ছিলেন তখন সুযোগ পেয়ে নিজের চশমার সঙ্গে ওঁর চশমাটা বদলে দিলেন। আপনার কপাল খারাপ যে সানগ্লাসটা হালকা হওয়ায় হাতে নিয়েই ওজনের ফারাক আর কারচুপিটা ধরে ফেললেন ভদ্রলোক। সাত কোটি টাকার ধাক্কা সহ্য হল না। বাকিটা আপনি জানেন!'

বিরাজ এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে— 'আমিও জহুরি মানুষ বাবু। ও চশমাটার কাচ দেখেই তাই সন্দেহ হয়েছিল। উপরন্তু একদিন কর্তাকে ফোনে একজনকে বলতেও শুনে ফেলেছিলাম...!'

অবশেষে বামালসমেত চোর ধরা পড়ল। পলাপিসি সগর্বে ঘোষণা করলেন— 'আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম। চশমাটাই চুরি করেছিল ব্যাটা।'

'হ্যাঁ। অন্ধকারে ঢিল মেরেও প্রায় লাগিয়েই দিয়েছিলে। অব্যর্থ টিপ।' অধিরাজ বলল— 'সিরিয়াসলি। ভেবে দ্যাখো অলিম্পিকে যাবে কিনা!'

'হুঃ!' পলা পিসি মুখ ফোলালেন— 'ফালতু বকিসনি। ডিডাকশনটা তো ঠিক ছিল।'

'হ্যাঁ। তুমি ঠিক ডিডাকশন করেছিলে। আমিও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। চুরির মাল তো পাওয়া গেল।' অধিরাজ আকাশের দিকে তাকায়— 'এখন বাকিটা ঈশ্বর। প্রদীপবাবুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

গুংগার গাছ

১

হঠাৎ একদিন বাজ পড়ে গাছটা পুড়ে গেল!

কয়েকদিন ধরেই তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছিল। খ্যাপা হাতির দঙ্গলের মতো হাওয়া তছনছ করে বেড়িয়েছে গোটা গ্রাম। উড়ে গেছে খড়ের চালা! দরমার বেড়া ভেঙে গেছে! ঘরবাড়ি বিপর্যস্ত!

এ গ্রামে শিবু মহাজন ছাড়া আর কারোর পাকা বাড়ি নেই। ভয়ার্ত বিপন্ন মানুষগুলো প্রথমে সেখানেই আশ্রয় চাইল। সেখান থেকে গলা ধাক্কা খেয়ে শেষপর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিল মহাকালীর মন্দিরে। বহুদিনের পুরোনো মন্দির। একসময় হয়তো শক্তপোক্তই ছিল। এখন তার অবস্থাও নড়বড়ে। ইট কাঠ পাথর সর্বস্ব শুধু প্রাচীন ফসিলটাই পড়ে আছে। থাকার মধ্যে রয়েছে মহাকালীর ভাঙাচোরা একটি বিগ্রহ আর একটা জং ধরা ত্রিশূল।

গ্রামের অসহায়, ঘরছাড়া মানুষগুলো সেই জরাজীর্ণ কঙ্কালকেই আঁকড়ে ধরে অনাহারে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিল। পেটে ভাতের এক কণাও নেই, তেষ্টা পেলে খাবার জল নেই, তবু মাথার ওপরে একটা ছাত তো আছে! যদিও তার তলার মানুষগুলো মুহুর্মুহু ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে থরথর করে কেঁপে ওঠা ছাতের শব্দ শোনে। আর প্রমাদ গোনে, এই বুঝি ছাতটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের ওপরে!

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দেবী মহাকালী এখনও মহাজনদের দলে ভেড়েননি। তাঁর দয়ায় মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচল। চারদিন, চাররাত্রি বজ্রবিদ্যুতে সবাইকে ধমকে চমকে দিয়ে, গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন ছারখার করে অবশেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিদায় নিল। কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে দিয়ে গেল শেষ কাম।! মধ্যরাতে আধোতন্দ্রায় থাকা মানুষগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় সেদিন একটা পেল্লায় বাজ পড়েছিল। লোকগুলো তার বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করে। অমন একটা বাজ যদি মন্দিরের ওপরও পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই!

শেষপর্যন্ত দেবীর অসীম কৃপায় কোনও অনর্থ হয়নি। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। পরের দিন সকাল থেকে আবার সব স্বাভাবিক। মেঘ কেটে গিয়ে সোনালি রোদ্দুর উঠেছে। গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত হয়ে নিজের নিজের ঘরের দিকে ফিরতে শুরু করে। ঘর তো তখন

আর ঘর নেই! সব ধ্বংসস্তূপ! অবস্থা দেখে সবার মাথায় হাত! আপাতত প্রাণ বাঁচলেও মাথা গুঁজবে কোথায়, খাবে কী তার ঠিক নেই! মুখে শত দুশ্চিন্তার কাটাকুটি নিয়ে নীরবে, পরিশ্রান্ত দেহে ফিরে আসছিল তারা।

এমন সময়েই পরিষ্কার আকাশ থেকে যেন আচমকা ফের একটা বাজ এসে পড়ল তাদের মাথায়! এ কী! এমন সম্ভাবনার কথা তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি! গ্রামের প্রান্তসীমায় ডালপালা মেলে এতদিন দাঁড়িয়েছিল গুংগার গাছ! সেটা কোথায়! কী সর্বনাশ!

তারা হাঁ করে দেখল গাছটা যেন ন্যাড়া হয়ে গেছে! তার মস্ত বড়ো বহর, বিস্তৃত ডালপালা শুকিয়ে এইটুকু! আগের রাতে যে মোক্ষম বাজটা পড়েছিল তার ধাক্কাতেই অতবড়ো বটগাছটা পুড়ে ছারখার!

দৃশ্যটা দেখে সবাই থ! কারোর মুখে কোনও কথা নেই। শুধু গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, নারায়ণদাদু বিড়বিড় করে বলেছিলেন— 'সর্বনাশ! মহা সর্বনাশ!'

ছোট্ট পাঁচু নারায়ণদাদুর কথা বুঝতে পারেনি— 'কী হয়েছে দাদু?'

দাদু গাছটার দিকে আঙুল তুলে বললেন— 'সনাতন গুনীন এই গাছটার সঙ্গে গুংগাকে বেঁধে রেখেছিল। এখন গাছটাও পুড়ে গেল! গুংগা ছাড়া পেয়ে গেছে। সারা গ্রামের ওপর এবার মহা সর্বনাশ আসতে চলেছে!... মহা সর্বনাশ!'

— 'গুংগা কে?'

চতুর্দিক থেকে 'চুপ চুপ' ধ্বনি উঠল। নারায়ণদাদু বললেন— 'নাম নিস না পাঁচু। নাম নিলে ওদের শক্তি আরও বাড়ে।'

— 'কার শক্তি বাড়ে?'

দাদু কোনও কথা না বলে তার নীলাভ ধূসর চোখদুটো রেখেছিলেন পাঁচুর চোখের ওপরে। সেই দৃষ্টিতেই পাঁচুর বুকের ভেতরটা শিমশিম করে উঠেছিল! অভুক্ত, অবসন্ন ছেলেটার মনে হয়, নিশ্চয়ই গুংগা কোনও ভয়ংকর কিছু। জন্ম থেকেই সে গুংগার গাছটাকে দেখে আসছে। কিন্তু কেন ওটার নাম 'গুংগার গাছ' তা তাকে কেউ বলেনি। যখনই জিজ্ঞাসা করেছে তখনই সবাই মিলে সভয়ে 'চুপ চুপ' করে উঠেছে। কৌতূহলী চোখে সে লক্ষ করেছে, একটা মোটা লাল রঙের দড়ি দিয়ে বটগাছটা বাঁধা! এমনভাবে দড়িটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে আটকানো যে দেখলেই সন্দেহ হয়, শুধু গাছ নয়, গাছের সঙ্গে আরও কাউকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

এতদিনে জানল যে গুংগাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল গাছটার সঙ্গে। কিন্তু গুংগা কে? কোনও বদমায়েশ লোক?

সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই নারায়ণদাদু ফের ফিশফিশ করে উঠলেন— 'চুপ কর পাঁচু। ওদের বদমায়েশ বলতে নেই। এতদিন বাঁধা ছিল। এখন ছাড়া পেয়ে কী করবে ঠিক নেই। ওরা সবজায়গায় থাকতে পারে। হয়তো তোর পেছনে দাঁড়িয়েই সব শুনছে। যদি শোনে তুই ওকে 'বদমায়েশ' বলছিস...!' বলতে বলতেই ডানহাতটা কপালে ছোঁয়ালেন— 'দুগ্গা... দুগ্গা...'।

তাঁর আশঙ্কা যেন আতঙ্ক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। শীর্ণ মানুষগুলোর মুখ ভয়ে চুপসে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে যদিও বা রক্ষা পাওয়া গেল, গুংগার হাত থেকে বুঝি আর রক্ষা নেই!

২

গ্রামের নাম শিবনারায়ণপুর।

এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই আর-এক পশ্চিমবঙ্গ আছে যার খোঁজ খুব কম লোকেই রাখে। বেশিরভাগ লোকই সেই পশ্চিমবঙ্গকে চেনে না। শুধু কোনও কারণে সেখানে সাংঘাতিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তবেই খবরের কাগজের পাতায় তার নাম জানা যায়। শহরের মানুষ গরম গরম চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজে সেই অঞ্চলের কথা পড়ে আর ভাবে— 'আরে, এমন জায়গাও পৃথিবীতে আছে নাকি!' তারপর অবশ্যম্ভাবী ভাবেই তার কথা ভুলে যায়।

শিবনারায়ণপুর তেমনই অচেনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ছোট্ট একটা গ্রাম। দশ বছর আগে দুর্ভাগ্যবশত খবরের কাগজে তার নাম দু-একবার এসেছিল। কলকাতায় যখন নানারকমের দেশি-বিদেশি খাবারের ভাণ্ডার উপচে পড়ছে, ঠিক তখনই শিবনারায়ণপুরে দুর্ভিক্ষ তার মরণখেলা দেখাচ্ছিল। না খেতে পেয়ে এই গ্রামের মানুষেরা মারা পড়ছিল। আঞ্চলিক অথবা 'ম্যান মেড' দুর্ভিক্ষে ঘর-কে-ঘর উজাড় হয়ে গিয়েছিল তখন।

গুংগার কাহিনি তখনকারই। জ্যান্ত অবস্থায় সে এক বোবা-কালা নিরীহ মানুষ ছিল। তার ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ওই বটগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে। বেঁচে থাকতে তাকে কেউ চিনত না। কিন্তু মৃত্যুর পর সে নিজেকে চেনাতে শুরু করল।

সরকারি সাহায্য যতক্ষণে এসে পৌঁছোল, ততক্ষণে না খেতে পেয়ে প্রায় অর্ধেক গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে। যারা বেঁচেছিল তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। সে অত্যাচারও অনেকের সহ্য হল না। বিষাক্ত খাবারের বিষক্রিয়ায় মারা গেল আরও অনেকেই। কেউ কেউ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, কেউ ভিটেমাটির মায়ায় গ্রাম ছেড়ে পালাতে পারল না। শেষপর্যন্ত মাত্র কয়েকঘর মানুষ দুর্ভোগ ও রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে টিকে থাকল ওখানেই। আস্তে আস্তে খানিকটা স্বাভাবিক হল জনজীবন।

কিন্তু এই ঘটনার বছরখানেক পর থেকেই শুরু হল আর-এক উপদ্রব!

গুংগা, তথা বোবা লোকটার আসল নাম কেউ জানত না। বেশিরভাগ লোকই তাকে গুংগা নামে চিনত। আর যারা ওর আসল নাম জানত, তারা সকলেই দুর্ভিক্ষে ফৌত হয়ে গেছে। লোকটা না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরও ওর অনির্বাণ খিদের জ্বালা শান্ত হয়নি। বিন্দিপিসির বুড়ো মোরগটা প্রথমে নিখোঁজ হয়েছিল না রাসুখুড়োর কচি পাঁঠাটা, তা নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। যাইহোক, দুটোকেই

শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল ওই বটগাছটার নীচে। বলাই বাহুল্য আস্ত অবস্থায় নয়। মোরগটার ঝুঁটি, পালক আর কিছু হাড়গোড় এবং পাঁঠাটার স্রেফ মুণ্ডু আর ল্যাজই বাকি ছিল! বাদবাকিটা যে কোথায় গেল কে জানে।

সেই শুরু। তারপর ক্রমান্বয়ে একে একে লোপাট হতে শুরু করল নানারকমের খাদ্যবস্তু। নারায়ণদাদুর হাঁস, পান্তজেঠুর মাচার আস্ত কুমড়ো, শিবু মহাজনের রান্নাঘর থেকে একটা আস্ত তাজা রুই হাওয়া হল! শুধু তাই নয়, সুবল চাষি সারাদিন মাঠে খেটে দুপুরবেলায় ওই বটগাছের ছায়াতেই বসে দুপুরের ভাত খাচ্ছিল। খাওয়া বলতে দু-মুঠো ভাত, নুন আর কাঁচালঙ্কা। সবে এক গরাস ভাত মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় মাথার ওপরে কী যেন অদ্ভুত একটা শব্দ! মুখ তুলে যা দেখল, তাতে তার রক্তহিম! হাতের ভাত ফেলে সেই যে দৌড় মারল, থামল গিয়ে সোজা পাঁচক্রোশ দূরে তার শ্বশুরবাড়িতে! উঠোনে দড়াম করে পড়ে শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিল— 'গুংগা... গুংগা...!' এর বেশি কিছু বলার আগেই মুখে ফেনা তুলতে তুলতে স্থির হয়ে গিয়েছিল সে।

সুবল কী দেখেছিল তা কোনওদিনই জানা যায়নি। কিন্তু এসব যে গুংগার কাণ্ড তা বুঝতে কারোর বাকি রইল না! গ্রামের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই ভূতের নামজাদা ওঝা সনাতন গুনীনকে ডেকে আনল। সনাতন রক্ষাকালীর মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে গ্রামবন্ধন করে ভৈরবকবচ সহযোগে গুংগার ক্ষুধিত প্রেতাত্মাকে লাল দড়ি দিয়ে আটকে ফেলল ওই গাছেই! তারপর থেকে সে ওই গাছে বন্দি হয়ে আছে। কারোর অনিষ্ট করার সুযোগ এখন তার নেই। তবে এখনও, বিশেষ করে অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় তাকে গাছ থেকে ঝুলতে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা পারতপক্ষে ও রাস্তা মাড়ায় না। কিন্তু লোকমুখে শোনা যায় গুংগার ভীষণ প্রেতাকৃতি বর্ণনা! চোখ দুটো টকটকে লাল। কষ থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে! ভীষণ খিদেয়, অথবা শ্বাসকষ্টে তার জিভ ঝুলে আছে। আর সেই জিভ দিয়ে টপটপ করে চুঁইয়ে পড়ছে তাজা রক্ত!

সেই গুংগা এতদিন বাদে ছাড়া পেয়েছে। দশ বছর ধরে তার লালায়িত জিভ কোনও খাদ্যবস্তুর স্বাদ পায়নি। এখন সে তার ক্ষুধিত অন্তঃকরণ নিয়ে কী অনিষ্ট করবে কে জানে!

নারায়ণদাদুর সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। তিনি বিড়বিড় করে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন।

— 'সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো দাদু!'

বিজু নাপিতের ছেলে সুখু কোনওমতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ভগ্নদূতের মতো সংবাদ দিল— 'সনাতন গুনীন মরে গেছে।'

রাসুখুড়ো বিস্মিত— 'সে কী! কবে মরে গেল!'

— 'পরশু'। সুখু কোনওমতে জবাব দেয়— 'ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছিল। মাথায় গাছ পড়ে মরে গেছে।'

খবরটা শুনে সকলেরই মুখে ভয়ের ছাপ পড়ে। এ কী দুর্ভোগ! একেই ঝড়-বৃষ্টির দরুণ লোকগুলো সব হাঘরে-হাভাতে হয়েছে। কোথায় থাকবে, কী খাবে তার ঠিক নেই। তার ওপর ভূতের ভয়! আর এর মধ্যেই সনাতনের মৃত্যু সংবাদ!

নারায়ণদাদুর বলিরেখা কুঞ্চিত মুখে আরও কয়েকটা ভাঁজ চিড়বিড় করে উঠল। পুরোনো লোক হওয়ার দরুণ অনেক খারাপ দিন দেখেছেন। সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু দুঃসময় যেন এবার পিছু ছাড়তেই চাইছে না! একেই এ গ্রামে তেমন ভালো ফসল ফলে না। মাটি তেমন উর্বর নয়। তার ওপর মহাজনের ধার! লোকটা একেবারে চশমখোর। পারলে বুকে পা দিয়ে টাকা আদায় করে। ওদিকে খেতে ধানের গোড়ায় জল জমে গেছে। বর্ষায় আশপাশের পুকুরগুলো সব ভেসে যাওয়ার দরুণ খেত থেকে জল নামছেই না। বাঁধ কেটেও জল নামানো যাচ্ছে না। পুকুর ভেঙে জল ক্রমাগতই ঢুকছে খেতের মধ্যে। নারায়ণদাদু অভিজ্ঞ লোক। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন খুব তাড়াতাড়িই আর-একটা দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে। ধান পচবে। ফসল হবে না। মহাজনের ধার শোধ তো দূরের কথা, নিজের ঘরে দু-মুঠো ভাতও জুটবে না।

এর মধ্যেই মূর্তিমান কালান্তক গুংগা জিভ লকলকাচ্ছে। তিনি আর ভাবতে পারলেন না। রাসুখুড়ো তার হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তবে উপায়?'

উপায় অবশ্য করতে হল না। তার আগেই বিপদ এসে হাজির!

পেটে অন্নের দানা নেই। মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। অবসন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ভূত তাড়ানোর আগে প্রাণধারণের কাজেই মন দিয়েছিল। কোনওমতে মাথার ওপরে খড় দিয়ে একফালি চাল তৈরি করে মাটির ওপরে খড় বিছিয়ে থাকছিল তারা। ছেলেমেয়েদের দু-বেলা খাওয়ানোর চিন্তা নেই। দশ বছরে শিবনারায়ণপুরে দুটো পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, একটা সরকারি প্রাইমারি স্কুল। দ্বিতীয়ত, একটু দূরেই একটা দাতব্য হাসপাতালও তৈরি হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলেই মিড-ডে-মিলের কৃপায় দুপুরের খাবারটা পাওয়া যায়। আর রাতে আলুসেদ্ধ, কলমীশাক সেদ্ধ দিয়ে কোনওমতে চালিয়ে দেওয়া যায়। ছোটোদের একবেলা খিচুড়ি, ভাত-ডাল জুটলেও বড়োদের কচু, ঘেঁচু, শাপলাই সম্বল। তাও না জুটলে পেয়ারাপাতা, তেঁতুলপাতা ভিজিয়ে কোনওমতে দিন গুজরান।

ছোট্ট শিশুরা এই দুর্যোগের দিনেও বায়না করে— 'মা, ভাত খাব। ভাত দে।'

মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাদের মুখে শাকসেদ্ধ তুলে দিয়ে বলে— 'আজ এই খা বাপ। কাল ভাত দেব।'

এভাবেই কেটে গেল কিছুদিন। দিনের পেছনে হপ্তা। তার পেছনে মাস। যতদিন যায় লোকগুলো ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে। এভাবে আর কতদিন? দশ বছর আগের দুর্ভিক্ষ কি তবে আবার ফিরে আসছে?

দুর্ভিক্ষ আসত কী না কে জানে। কিন্তু তার আগেই দশ বছর আগের আর-এক আতঙ্ক ফিরে এল।

সেদিন রাতে সুখুর ঘুম আসছিল না। পেটে খিদের লকলকে আগুন। এপাশ-ওপাশ করতে করতেই সে উঠে পড়ল।

তখন মধ্যরাত্রি। সুখু চুপচাপ চালা থেকে বেরিয়ে গেল। একরকম হারা-উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিল। চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার। আধফালি নীলাভ চাঁদ কেমন যেন নির্লজ্জ ক্রূর হাসি হাসছে। বট-পাকুড়ের পাতায় অদ্ভুত একটা খসখস শব্দ। ঝিঝি পোকা কেমন যেন করুণ সুরে তান ধরেছে।

কী মনে হতেই সে শিবু মহাজনের বাড়ির পথ ধরল। শিবুর পুকুরে অনেক মাছ আছে। তার খলবল শব্দ দূর থেকে শুনেছে। কিন্তু চতুর্দিকে কাঁটাতার থাকার দরুণ মাছ চুরি করা অসম্ভব। তার ওপর শিবু আবার একটা কুকুর পুষেছে। কুকুরটাও তার মালিকের মতোই হোঁকা। স্বভাবও তেমন। দেখলেই খ্যাঁকখ্যাঁক করে কামড়াতে আসে। সুখুর সন্দেহ হয় কুকুরটা আসলে শিবুরই যমজ ভাই। কুম্ভের মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর পেছনে কাঠি দিতে গিয়ে ব্রহ্মঅভিশাপে কুকুর হয়ে গেছে। তাই সে কামড়াতে পারে। শিবু এখনও সে বিদ্যেটা রপ্ত করতে পারেনি।

শিবুর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অদ্ভুত একটা খলখল শব্দ শুনতে পেল সে। দু-পা এগোতেই পায়ে জলের শীতল স্পর্শ! আর তার মধ্যেই যেন কী একটা আন্দোলন চলছে! হঠাৎ পায়ের কাছে মসৃণ কী যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ল! ওরে বাবা! সাপ নাকি! সুখু তিন লাফ মেরে পিছিয়ে আসে। পরক্ষণেই চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছে জিনিসটাকে। সাপ নয়, মাগুরমাছ! বেশ বড়োসড়ো, হৃষ্টপুষ্ট। শিবুর পুকুর ভেসে যাওয়ায় মাছটা ডাঙায় এসে পড়েছে। ওঃ ভগবান!

সুখু একবারের চেষ্টাতেই খপাৎ করে ধরে ফেলল মাছটাকে। শক্ত করে ধরে পেছনে ফিরতে যাবে এমন সময়ই বিপদ! কে যেন তার হাত সবলে চেপে ধরল!

কী সর্বনাশ! শিবু মহাজন নাকি! সুখু ভয়ে ভয়ে সেদিকেই তাকায়। কিন্তু তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! শিবু নয়, একটা লম্বা কালো সিঁড়িঙ্গে লোক! লাল চোখ দুটো অন্ধকারেও দপদপ করে জ্বলছে। ঘাড়টা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে! আধহাত জিভ বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে!

গুংগা!

পরদিন সকালে সুখুকে ওখানেই পাওয়া গেল। তখন সে অজ্ঞান! সারা গা ক্ষতবিক্ষত। কে যেন তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে। অচেতন অবস্থায় সুখু প্রলাপ বকছিল— 'গুংগা আসছে!... আমায় মেরে ফেলবে... খেয়ে ফেলবে...।'

গ্রামের লোকেরা বুঝল গুংগা ফিরে এসেছে। শুধু ফিরেই আসেনি, কালান্তক মূর্তিতে এসেছে।

৪

গুংগার আতঙ্কে কয়েকদিনের মধ্যেই শিবনারায়ণপুর কাঁপতে শুরু করল। দশ বছর বাঁধা থেকে তার খিদে আগ্রাসী মূর্তি ধরেছে। প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে সহিংস।

সুখুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দাতব্য হাসপাতালে। তার ক্ষত দেখে দাতব্য হাসপাতালের প্রবীণ ডাক্তার অবনীবাবু আঁতকে উঠলেন— 'এ কী! এভাবে আঁচড়াল কে?'

সুখুর বাবা বিজু নাপিত হাপুশ নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল— 'গুংগা'।

বলাই বাহুল্য গুংগার তত্ত্ব অবনী ডাক্তারের মাথায় ঢুকল না। তিনি বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন— 'না, এমনভাবে আঁচড়ানো কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়... আশ্চর্য!'

সুখুর ফ্যাকাশে মুখ দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন ছেলেটার শরীরে রক্ত প্রায় নেই!

খবরটা শুনে গোটা শিবনারায়ণপুর কেঁপে উঠল! কী সর্বনাশ! অতবড়ো জোয়ান ছেলেটার শরীরে রক্ত নেই! গুংগা আঁচড়াতে কামড়াতে শিখেছে সেটা জানা কথা। কিন্তু সে যে রক্ত চুষতেও পারে তা জানা ছিল না! দশ বছরে তার খিদে এমন প্রলয়ংকর মূর্তি ধরেছে! এখন সে খাদ্যবস্তুতেও সন্তুষ্ট নয়। মানুষের রক্তও খেতে শুরু করেছে।

সুখুর ঘটনার পর কয়েকটা দিন কেটে গেল। সারা গ্রাম আশঙ্কায় থমথমে। এবার কার পালা কে জানে! সবারই বুকের ভেতরে আতঙ্কের টিপটিপ! গুংগা এবার সরাসরি আক্রমণ না করলেও চতুর্দিকে দেখা দিতে লাগল। বিন্দিপিসি একবার ভোর রাতে পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে দেখলেন একটা লম্বা সিঁড়িঙ্গে মূর্তি নিঃশব্দে গাছের মাথায় মাথায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। রতন সর্দার মাটির ভেতর থেকে একটা বড়োসড়ো রাঙা আলু টেনে তুলছিল। রাতে রাঙা আলু সেদ্ধ খেয়ে কয়েকটা দিন চলে যাবে তার। কিন্তু যেই মুহূর্তে আলুটাকে টেনেটুনে মাটির ওপরে তুলেছে, তখনই চোখে পড়ল একটা বিরাটাকৃতি পাখি তার মাথার ওপরে চক্কর কেটে বেড়াচ্ছে। পাখিটা ঠিক পাখি নয়। বরং একটা মানুষের মতো দেখতে তাকে! লম্বা কালো চেহারা, জিভ বের করা, ঘাড় মচকানো একটা মানুষ! তার জিভ দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে!

'আই বাপ' বলে রাঙা আলু ফেলে সেই যে সে দৌড় মারল, বাড়ি না পৌঁছে থামল না।

শিবনারায়ণপুর আতঙ্কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো পড়ে রইল। খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়তে পারে। কিন্তু যে মানুষ নয়, অভদ্রের মতো আঁচড়ে কামড়ে দেয়, গাছের মাথায় লাফ মেরে মেরে বেড়ায়, এমনকি উড়তেও পারে, এমন বিভীষিকার সঙ্গে কী করে লড়বে!

এর ঠিক কয়েকদিন পরেই ঘটল তার দ্বিতীয় আক্রমণ!

আশপাশের ডোবায় কিছু শাপলা শালুক হয়েছিল। রাসুখুড়ো জলে নেমে রাতের খাবারের জন্য তাই সংগ্রহ করছিলেন। হঠাৎ তার মনে হল ডোবার ভেতরে একটা ভীষণ কিছু কাণ্ড ঘটছে! জলের ভেতর অদ্ভুত আলোড়ন। খলবল খলবল করে জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে। ভয় পেয়ে শাপলা শুদ্ধ তিনি জল থেকে উঠে আসতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই জলের ভেতর থেকে দুটো কালো কুচকুচে হাত বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এসেছে। কথা নেই বার্তা নেই, হাত দুটো তার গলা টিপে ধরল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে রাসুখুড়ো দেখতে পেলেন জলের তলায় একটা বীভৎস মুখ! লাল টকটকে চোখ, রক্তাক্ত জিভ। আর আগে যা কেউ কোনওদিন লক্ষ করেনি তাও নজরে পড়ল তার। দেখলেন মুখটার কষ বেয়ে বেরিয়ে এসেছে দুটো তীক্ষ্ণ সুঁচলো শ্বদন্ত!

রাসুখুড়োও মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। দাতব্য হাসপাতালের অবনী ডাক্তার তাকে দেখেও অবাক হলেন। আশ্চর্য! এই মানুষটির দেহেও রক্ত প্রায় নেই বললেই চলে! এইবার তাকে চিন্তিত লাগল।

শিবনারায়ণপুরের লোকেরাও জানল যে গুংগার তীক্ষ্ণ দাঁতও আছে। সেই দাঁত দিয়ে ফুটো করে সে শরীরের রক্ত চুষে নেয়।

এমন খবর খুব বেশিদিন চাপা থাকে না। গুংগার আতঙ্ক শিবনারায়ণপুর থেকে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোক এল। পেছন পেছন এল টেলিভিশন চ্যানেল। গুংগার খবর কভার করার জন্য তারা দিনের-পর-দিন ওখানেই পড়ে থাকল। কয়েকদিনের মধ্যে এসে পড়লেন প্যারাসাইকোলজিস্ট, স্পিরিচুয়ালিস্টরা। তারা ভূত দেখার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। যুক্তিবাদী, নাস্তিকরাই বা বাদ থাকেন কেন? তারাও হাজির। ভূত আছে কী নেই, সেই নিয়ে লাগল জব্বর তর্ক। যুক্তিবাদীদের মধ্যে প্রধান ড. বিশ্বাস বললেন— 'কোথায় ভূত? ওসব স্রেফ গাঁজাখুরি কথা'।

প্যারাসাইকোলজিস্ট ড. দেবরায় বললেন— 'ভূত যদি না থাকে তবে এখানে কী হচ্ছে? গুংগার কীর্তি তো নিজের কানেই শুনছেন'।

— 'শুনতে তো অনেক কিছুই পাই। লোকে বলছে সে নাকি উড়ে বেড়ায়, জলে ডুবে থাকে, গাছের মাথায় লাফিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এর মধ্যে একটাও তো চোখে দেখলাম না'।

বেশ কিছুক্ষণ চাপান-উতোর চলল। শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে সামনের অমাবস্যায়

প্ল্যানচেট করে গুংগাকে ডাকা হবে। অবিশ্বাসীদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে।

ড. বিশ্বাস হেসে বললেন— 'প্ল্যানচেট করে কোন হাতির মাথা হবে? মিডিয়াম তো হবে আপনার লোক। সে তো আপনার কথা মতোই চলবে।'

ড. দেবরায় বাক্‌বিতণ্ডায় না গিয়ে গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা নারায়ণদাদুকেই নিরপেক্ষ মিডিয়াম হিসেবে বেছে নিলেন। ঠিক হল তিনদিন পরে, অমাবস্যায় প্ল্যানচেট হবে। দাদু প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত নগদ পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে রাজি হলেন।

অন্যদিকে টিভি চ্যানেলের লোকেরা রাতদুপুরে ক্যামেরা নিয়ে শিবনারায়ণপুর টহল দিতে শুরু করল। সেই পোড়া গাছটাকে দেখিয়ে বলল— 'এই দেখুন সেই গাছ। এখানেই কালান্তক গুংগাকে এতদিন বেঁধে রাখা হয়েছিল। বেঁধেছিলেন সনাতন গুনীন। আজ সেই গুংগা তার অসীম খিদে নিয়ে এখানেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে... রক্ত চুষে বেড়াচ্ছে...'

টেলিভিশনের টিআরপি ধরধর করে বাড়তে লাগল। রিপোর্টাররা গুংগার ইতিহাস এবং তার বর্ণনা এমনভাবে জানাতে লাগল যেন স্বচক্ষেই তাকে দেখেছে। আসলে গোটাটাই গ্রামের মানুষের কাছে শোনা কথা। যথারীতি মাগনায় নয়। রীতিমতো কাঞ্চনমূল্যে! ছোট্ট পাঁচুর আঁকা গুংগার ছবি, গুংগার মুখোশ দেখিয়ে তারা দর্শককে ভয় দেখাতে শুরু করল। আর দর্শকরা গভীর রাতে একা হলঘরে বসে ভয় পেতে পেতেও গোগ্রাসে গিলতে লাগল প্রত্যেকটা বুলেটিন!

৫

— 'খুড়ো, কী মনে হয়?'

হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুখু গভীর রাতে রাসুখুড়োর সঙ্গে কথা বলছিল।

— 'কীসে কী মনে হয়?' হাই তুলে রাসুখুড়ো বললেন।

— 'নারাণদাদু ঠিকমতো গুংগার অ্যাক্টো করতে পারবে? লোকগুলোকে ভয় দেখাতে পারবে?'

— 'সে আর বলতে?' রাসুখুড়োর নির্লিপ্ত উত্তর— 'এ মতলব তো তারই। তুই বাপের খুর দিয়ে হাত পা কাটলি। আমি ডুবে ডুবে একপেট জল খেলাম তো তার কথাতেই। বুড়ো ঠিক উতরে দেবে। ভাবিস না।'

সুখু বিড়বিড় করে বলে— 'যখন দুর্ভিক্ষে লোক মরছিল, তখন কাকপক্ষীতেও আসেনি। আর এখন দেখো, ভূত দেখার জন্য কড়কড়ে নোট দিয়ে কত লোক চালা ভাড়া করছে। পয়সা দিয়ে মুখোশ কিনছে। গপ্প শোনার জন্য টাকা দিচ্ছে। আরও কত কী! ডাক্তার বলে গায়ে রক্ত নেই। আলু, কচুসেদ্ধ, শাপলা খেয়ে কি কারও শরীরে রক্ত হয়?'

রাসুখুড়ো মৃদু হাসলেন— 'শিবনারায়ণপুর তীর্থ হয়ে গেল, বুঝলি? এখন দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জুটবে অন্তত।'

— 'হয়তো। বুঝলে খুড়ো, কাল ডাক্তারকে বলব দু-মুঠো ভাত দিতে। এই লাপসি খেতে আর ভালো লাগে না। তার সঙ্গে একটু ডাল কি দেবে না বলো?'

রাসুখুড়ো কোনও উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরলেন। হোক লাপসি, তবু ঢঙের খাবার তো বটে। ভাতের কথা মনে পড়তেই মন হু-হু করে উঠল। কতদিন ভাতের গন্ধ পাননি। নারায়ণ বলেছিলেন— 'ক-টা দিন হাসপাতালে থাক। অন্তত দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাবি। শোয়ার বিছানা পাবি।'

এইটুকুর জন্যই এত নাটক!

— 'আচ্ছা খুড়ো...'। সুখু ফের বলল— 'সত্যিই কি গুংগা বলে কেউ ছিল?'

— 'জানি না'। খুড়ো বলেন— 'যদি থাকেও তবু তাকে ভয় নেই। দুনিয়ায় খিদের চেয়ে বেশি ভয়ংকর আর কিছু নেই। বুঝলি?'

বলতে বলতেই কপালে হাত ঠেকান তিনি। যে লোকটা দশ বছর আগে না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল, আজ তার জন্যই হয়তো গোটা গ্রাম বাঁচবে। এখন ভালোয় ভালোয় নারায়ণবুড়ো শেষটুকু সামলে নিলেই হয়। দুগ্গা... দুগ্গা...!

হ্যালুসিনেশন

'ডক্টর... আমি কি বেঁচে আছি?'

প্রশ্নটা শুনে ডাক্তারবাবুর ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়ল।

মাথার ওপরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। তাতে সামনের মানুষটাকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও তার অস্পষ্ট ছায়া ছায়া অবয়ব বোঝা যাচ্ছিল। নাকের ওপর ভারী চশমার কাচ আধা আলো আধা অন্ধকারেই চকচক করে উঠছে। মুখের চাপদাড়ির জঙ্গল বুঝতেও অসুবিধা হচ্ছিল না।

মনস্তত্ত্ববিদের ঘর যেমন হয়, এ ঘরটাও তেমনই। আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। ডাক্তারবাবু টেবিলের ওপ্রান্তে বসে আছেন, আর রোগী এপ্রান্তে। কাউকেই বিশেষ স্পষ্ট দেখার উপায় নেই। শুধু দেয়ালে দুটো ক্ষীণ ছায়া মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠছে।

ডক্টর সিনহা প্রশ্নটায় বেশ কৌতুকবোধ করলেন। আস্ত একটা জলজ্যান্ত লোক জিজ্ঞাসা করছে যে সে বেঁচে আছে কিনা!

— 'এমন মনে হচ্ছে কেন আপনার?'

লোকটা যেন একটু ইতস্তত করল। একটু উশখুশ করে উঠে বলল— 'একটা সিগারেট খেতে পারি?'

এখানে ধূমপান মানা হলেও লোকটার অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবুর দয়া হয়। অসম্ভব ভয়ে সে জড়োসড়ো! গলার স্বর কাঁপছে! একটু যেন ফ্যাঁসফ্যাঁসেও!

— 'নিশ্চয়ই'।

সে কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল। হাত দুটোও থরথর করে কাঁপছে। লাইটার জ্বালাতেই ডাক্তারবাবু তার চোখ দুটো একঝলক দেখতে পেলেন। কালো কুচকুচে চোখ। যেন অন্ধকার জমে আছে চোখে! একবারের জন্য যেন মনে হল, লোকটার চোখের মণিটা নেই!

মুহূর্তের জন্য হলেও চমকে উঠেছেন তিনি। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়েছেন। না, হয়তো লাইটারের সামান্য আলোয় তার চোখের ভুল হয়েছে। একটা স্বাভাবিক মানুষের চোখ এমন হতেই পারে না।

একেই বলে ইল্যুশন!

লোকটা সিগারেটে উত্তেজিত কয়েকটা টান মেরে যেন একটু শান্ত হয়। বলে— 'ডক্টর, আপনি একটু দেয়ালের দিকে তাকাবেন প্লিজ?'

এমন উদ্ভট আবদারে তিনি অবাক ও বিরক্ত দুই-ই হলেন। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদদের চটে যাওয়ার উপায় নেই।

— 'কেন?'

সে ফিশফিশ করে বলে— 'দেখুন তো দেয়ালে ক-টা ছায়া দেখা যাচ্ছে?'

— 'আপনি নিজেই তো দেখে নিতে পারেন...!'

— 'আমার ভয় করছে!' অসম্ভব ভীত, সন্ত্রস্ত গলা তার— 'বলুন না। ক-টা দেখা যাচ্ছে?'

তিনি আরও অবাক— 'সে কি! ক-টা আবার দেখা যাবে! দুজন আছি, তাই দুটোই দেখা যাচ্ছে!'

— 'তিনটে নয় তো?'

— 'তিনটে! তিনটে কেন থাকবে?'

লোকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে— 'থ্যাঙ্কস। তাহলে তিনটে নেই...'

এবার বোধহয় ডক্টর সিনহা ভদ্রলোকের বিষয়ে কৌতূহল বোধ করলেন। লোকটার হাবভাব কেমন যেন উদ্ভট! ত্রিশ বছরের কেরিয়ারে অনেক উদ্ভট রোগীর দেখা তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এমন রোগী দেখেননি। ওকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সময় দিলেন। তারপর আলতো গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন—

— 'কী হয়েছে আপনার? কী সমস্যা?'

— 'বলব...' সে আস্তে আস্তে বলে— 'বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়!'

— 'কোথায়?'

লোকটা এবার অদ্ভুতভাবে তাকায় তার দিকে। ডাক্তারবাবুর মনে হল লোকটার চোখ যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল...

— 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন তো?'

— 'কেন করব না?'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে— 'তবে শুনুন... আমার নাম তপন মিশ্র। আমিও একজন ডাক্তার! সার্জেন।... হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমটা আমারই...'

ড. তপন মিশ্রের কথা

সেদিন রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি! মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে! এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং!

আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম! ঘুম আসেনি। পাশেই আমার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে ঘুমিয়ে কাদা। কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না। কী যেন অস্বস্তি কাজ করছিল মনের মধ্যে! আমার বেডরুমের জানলার কাচে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুতের নীল আলো ঝলসে ঝলসে উঠছে। বাইরে যেন একটা নীল কুয়াশা কখন আস্তে আস্তে এসে

জমাট বাঁধছিল! বৃষ্টির জলটাকেও যেন নীল মনে হয়!

ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তখন সেটারও প্রায় ফুরিয়ে আসার সময় হয়েছে। নীল শিখাটা ক্রমাগত ছোটো হয়ে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই একটু একটু করে ক্ষীণ রশ্মিটুকুও মুছে যাচ্ছিল।

মোমবাতিটা যখন প্রায় নিভতেই চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই, একদম স্তিমিত আলোয় হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে!

অসম্ভব! কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! চোখের সামনে কেউ নেই! অথচ দেয়ালে ওটা তবে কার ছায়া!'

আখ্যানের শুরুতেই ড. তপন মিশ্র ঘেমে উঠলেন। সামনের গ্লাস থেকে একচুমুক জল খেলেন। ড. সিনহা তাকে সময় দেওয়ার জন্যই হয়তো নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন।

একটু দম নিয়েই ফের বলতে শুরু করলেন ড. মিশ্র—

— 'সন্দেহ হল চোর-টোর ঢুকল কি না। ঘরে দামি জিনিস মানে, দামি ফার্নিচার তো আছেই। এছাড়াও গিন্নির কিছু গয়না আর ক্যাশ কিছু টাকা ছিল। বিছানার পাশেই একটা বন্দুক থাকে। লাইসেন্সড। নিজের সেফটির জন্যই রেখেছি। পয়সাওয়ালা ডাক্তার মানেই তার শত্রুর শেষ নেই। চোর-ডাকাতেরা প্রায় টার্গেট করেই বসে থাকে। দুষ্কৃতকারীরাও আজকাল খালি হাতে আসে না। তাই এই ব্যবস্থা।

বন্দুক আর টর্চ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম...। ঠিক তখনই মোমবাতিটা দপ করে একবার জ্বলে উঠে নিভে গেল।

জমাট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যায়! হাতেই টর্চটা ছিল। জ্বালাতে পারতাম। কিন্তু তার আগেই মনে হল, আমার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে! তার গরম নিশ্বাস আমার গায়ে এসে পড়ছে! মনে হল অন্ধকারের মধ্যেও একজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

— 'কে?'

টের পেলাম নিজের গলাই কাঁপছে! টর্চ জ্বালানোর সাহসও পাচ্ছি না! কারণ আমি জানি সেই চোখ দুটো আমার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে! অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। এমনকি তার ছায়া-ছায়া অবয়বও দেখতে পাই! ঠিক আমারই দৈর্ঘ্যের, একই প্রস্থের, এমনকি আমার মতোই গাউন পরা একটা ছায়ামূর্তি! আর কী ঠান্ডা তার দৃষ্টি! কী শীতল তার উপস্থিতি! যেন একটা মৃতদেহ! রিগর মর্টিস হওয়া দু-হাতে ক্রমশই আমায় জড়িয়ে ধরছে!

আমার কী হল জানি না। সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলাম না! চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার! তবু ঠিক আন্দাজ করতে পারছি তার চোখ দুটো! কী করে, কী ভাবে— কিছুই জানি না!

দপ করে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে দিলাম! আশ্চর্য! সামনে, পেছনে, পাশে— কোথাও

কেউ নেই! দেয়ালে আমার নিজেরই ছায়া পড়ছে... আর ঠিক তার পাশেই অবিকল আমার ছায়ার মতো আর-একটা ছায়া! যেন দুটো ছায়াই আমার। প্রথমটার মালিক আমি। দ্বিতীয় ছায়ার মালিক নেই! কোথাও নেই...! অথচ ছায়াটা ক্রমশই যেন দেয়াল ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আমার বিস্মিত চোখের সামনেই ধরছে অস্পষ্ট অবয়ব!...

চিৎকার করে উঠেছিলাম। সপাটে টর্চের এক বাড়ি বসিয়ে দিলাম ওর মাথা লক্ষ করে... আমার কপালটাও সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে উঠল... তারপর আর কিছু মনে নেই...!

ফের থামলেন ড. তপন মিশ্র। ড. সিনহা তার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। কৌতূহলী স্বরে বললেন— 'তারপর?'

— 'পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। কপালে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। মাথায় হাত দিতেই টের পেলাম একটা ব্যান্ডেজের উপস্থিতি! আমার কপালে কেউ ব্যান্ডেজ করে রেখেছে!

— 'কী হয়েছিল কাল রাতে?' আমার স্ত্রী অপর্ণা বেড-টি দিতে এসে প্রশ্ন করলেন— 'অমন চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন?'

কালকের ঘটনার কথা ভেবে নিজেরই অবিশ্বাস্য লাগছিল। একটা ছায়া কাল রাতে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনে... অথচ কোথাও কোনও মানুষ ছিল না! তখন ভয় পেয়েছিলাম। এখন ভাবতেই গোটা ঘটনাটা উষ্ণ মস্তিষ্কের হাবিজাবি মনে হল।

কিন্তু মাথার চোটটা! এটা কীভাবে লাগল!

যাইহোক, ব্যাপারটা চেপেই গেলাম। স্ত্রীকে বললাম রাতে উঠতে গিয়ে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে এই বিপত্তি!

স্ত্রী আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে— 'তোমার হাতে তো টর্চ ছিল। জ্বালাওনি কেন?'

প্রশ্নটাকে কোনওমতে এড়িয়ে যাই। ভাবলাম, ওটা দুঃস্বপ্ন! ভুলে যাওয়াই ভালো।

তখন কে জানত যে দুঃস্বপ্নটা এখনও শেষ হয়নি! সবে শুরু হল! সেদিন গোটা দিনটাই যেন একের-পর-এক দুঃসংবাদ নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আগের দিন এক পেশেন্টের গল-স্টোন অপারেশন হয়েছিল। রাতেও দেখেছি সে ঠিক আছে। সামান্য ব্রিদিং প্রবলেম ছাড়া আর কিছু প্রবলেম ছিল না। অথচ নার্সিংহোমে ঢুকতে না ঢুকতে সেই রোগীর আত্মীয়রা আমার ওপর প্রায় চড়াও হল! লোকটা মারা গেছে!

আমি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি যে সে মারা গেল কী করে! কালও তো বেঁচে ছিল। অপারেশন সাকসেসফুল! তবে!

মৃত মানুষটির আত্মীয়স্বজনেরা আমায় ঘিরে প্রায় তাণ্ডব করছিল। সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে এসে কোনওমতে উদ্ধার করল। মাথায় তখনও কিছু স্পষ্টভাবে ঢুকছে না। তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে নাইট শিফটের ডাক্তারদের আর মেট্রনকে ডেকে পাঠাই। লোকটার মৃত্যুর কারণ জানা দরকার।

— 'অক্সিজেন ডেফিশিয়েনসি স্যার'। নাইট শিফটের ডাক্তার মাথা নীচু করে জানায়— 'অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেওয়ার পরই লোকটা মারা যায়।'

— 'কী আশ্চর্য! অক্সিজেন মাস্ক খোলা হল কেন?' রাগে প্রায় কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতোই চেঁচিয়ে উঠি— 'যখন দেখা যাচ্ছিল যে ব্রিদিং ট্রাবল সামান্য হলেও হচ্ছে, তখন মাস্ক খুলতে তোমাদের কে বলেছিল?'

— 'আপনিই বলেছিলেন স্যার।' ও আমার দিকে তাকায়— 'ওটা অপারেশন থিয়েটারের অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল। আপনিই বলেছিলেন রিপ্লেস করতে।'

— 'রিপ্লেস করতে বলেছিলাম। একেবারে খুলে দিতে তো বলিনি!'

— 'নতুন কোনও ভরা সিলিন্ডার ছিল না অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট।' ডাক্তারটি আরও নম্র— 'আপনাকে আমিই জানিয়েছিলাম যে নতুন সিলিন্ডার এসে পৌঁছোতে মিনিট দশ লাগবে। সিলিন্ডার না এসে পৌঁছোনো অবধি পেশেন্টের অক্সিজেন রিপ্লেস করব কি না। কিন্তু আপনার আর-একটা আর্জেন্ট অপারেশন ছিল। ওটি-তে সিলিন্ডারটা দরকার ছিল। তাই আপনিই অর্ডার দিয়েছিলেন ওটি-র সিলিন্ডারটা ফেরত আনতে।'

কী বলতে চায় ও? লোকটার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী! অপারেশন থিয়েটারে অক্সিজেন সিলিন্ডারের উপস্থিতিটা বেশি জরুরি। দশ মিনিট পরেই তো নতুন অক্সিজেন চলে আসত। এমন তো নয় যে আমি লোকটাকে মারার জন্যই ওকে অক্সিজেন দিতে বারণ করেছি! দশটা মিনিট যদি সে অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে না পারে তবে আমার কী করার আছে!

মাথাটা দপ করে গরম হয়ে গিয়েছিল। কোনওমতে ঠান্ডা করি। এখন সামনে অনেক লড়াই। নার্সিংহোমে চিকিৎসার ত্রুটিগত কারণে মৃত্যু হলে তার দায়ভার অনেক! যে-কোনো মুহূর্তে প্রেস এসে পৌঁছোতে পারে। তাদের কী বলব? কীভাবে চাপা দেব এই ঘটনাটাকে!

— 'রিপোর্টে লিখে দাও যে লোকটির অবস্থা সিরিয়াস ছিল। গলব্লাডারে বেশিদিন ধরে স্টোন থাকার কারণে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। তাই অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো যায়নি।' আঙুল তুলে বলি— 'কিন্তু অক্সিজেন ডেফিশিয়েন্সির কথা কোনওভাবেই যেন ফাঁস না হয়।'

— 'কিন্তু স্যার, পোস্ট মর্টেম হলে...।'

— 'আমি সামলে নেব।'

টাকা আর ক্ষমতার জোরে যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টকে পালটে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি আমি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই সবাইকে বিদেয় দিয়ে একা কেবিনে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। যাক, কোনওভাবে সামলে নেওয়া যাবে। বিশেষ চিন্তার কিছু নেই!

কিন্তু চিন্তার তখনও কিছু ছিল।

কেবিনে বসে চা খেতে খেতেই আবার সেই অস্বস্তি! দুটো চোখ খুব তীব্র দৃষ্টিতে

আমাকে দেখছে! অদ্ভুত সেই চাউনি! সামনাসামনি কেউ নেই, ঘরে আমি একা! অথচ সেই অশরীরী চোখ অনুভব করতে পারছি।

হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হল, রিভলভিং চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাই। না... সেখানে কিছু নেই!... কেউ নেই...! একদম ফাঁকা!

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সামনের দিকে ঘুরতে যাব, চোখে পড়ল পেছনের দেয়ালে আমার ছায়া পড়েছে। কিন্তু একটা নয়! দুটো ছায়া! পাশাপাশি দেয়ালের সমান্তরালে দুটো একইরকম ছায়া। একটা আমার! আর-একটা আমার নয়! হতেই পারে না!

আমার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎগতিতে সামনের আয়নায় তাকালাম!... ড. তপন মিশ্র সাইকিয়াটিস্টের হাত চেপে ধরলেন— 'যা দেখলাম তা বিশ্বাস করবেন না!... কেউ বিশ্বাস করে না...।'

— 'কী দেখলেন...?'

— 'দেখলাম আয়নায় আমার প্রতিচ্ছবি পড়ছে। আর আমার ঠিক পেছনেই আর-একটা লোক! তার পোশাক-পরিচ্ছদ একদম আমার মতো! এমনকি তাকে দেখতেও হুবহু আমার মতোই! শুধু চোখ দুটোয় কোনও মণি নেই! একদম ফাঁকা! অন্ধকার কোটরের মতো শূন্য চোখে তাকিয়ে সে হাসছে! অথবা আমিই হাসছি আমার দিকে তাকিয়ে!

এ কী অদ্ভুত রহস্য! কী অদ্ভুত যন্ত্রণা! কাউকে বলার উপায় নেই! অথচ সহ্য করাও যায় না! সেই হাসির মধ্যে যত না ব্যঙ্গ, তার থেকেও বেশি ঘৃণা! ইচ্ছে হল ওর গলা টিপে ধরি! আমি ডাক্তার... কাউকে খুন করা আমার পেশা নয়... কিন্তু সেই মুহূর্তে... আমি... আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম...

ছায়াটার গলা টিপে ধরতেই মনে হল লোহার মতো মজবুত দুটো হাত আমারও গলা সাপটে ধরেছে! শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে... চোখে অন্ধকার দেখছি... অক্সিজেন... একটু অক্সিজেন...!

— 'এ কী! এ কী স্যার! কী করছেন... কী করছেন!'

কানে এল চিৎকার-চ্যাঁচামেচির শব্দ! বেশ কিছুক্ষণ চেতনা ছিল না। জলের ঝাপটায় হুঁশ ফিরল। চোখ মেলতেই প্রথম নজরে আসে মেট্রনের মুখ। সে উদ্‌বিগ্ন। জানতে চায়— 'স্যার, আপনি নিজেই নিজের গলা অমন ভয়ানকভাবে টিপে ধরেছিলেন কেন?'

আবার একটু থামলেন ড. মিশ্র। কী যেন একটু ভেবে নিয়ে ফের বলতে শুরু করেছেন— 'আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কী করব। তবে এইটুকু বুঝেছিলাম যে ওকে আক্রমণ করতে গেলে সে আঘাত আমার ওপরই পড়ছে। ওর মাথায় বাড়ি মারলে, আমার মাথায় চোট পড়ে, ওর গলা টিপে ধরলে আমার শ্বাস বন্ধ হয়। যাই হোক না কেন, নিজেকে বাঁচাতে গেলে ওকে মারা চলবে না।

সেই হিসেব মতোই চলতে শুরু করলাম। অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। কিন্তু যখনই চোখ পড়ে তখনই দেখি আমার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছায়া তাল মিলিয়ে চলেছে।

একটা আমার, অন্যটা আমার নয়। রোগী দেখি, অপারেশন করি—সবই চলছে নিয়ম মতো। অথচ একমাত্র আমি জানি যে, কিছুই ঠিক নেই। সবসময় সেই ছায়া আমার পেছনে ওঁত পেতে বসে থাকে। তার সদাসতর্ক নজর আমার ওপর। ও আমায় পায়ে পায়ে ফলো করছে। ওকে ছেড়ে যাবার উপায় আমার নেই! অথচ সহ্য করার ক্ষমতাও নেই। সবসময় ভয়ে শিঁটিয়ে থাকি, যদি কেউ ওকে দেখে ফ্যালে। যদি জানতে চায়— 'ড. মিশ্র, আপনার দুটো ছায়া পড়ছে কেন?'

এর মধ্যেই আর-এক ঝামেলা এসে ঘাড়ে পড়ল। একটি বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে হার্টের সমস্যা নিয়ে নার্সিংহোমে এসে ভরতি হয়েছিল। হার্ট রিপ্লেসমেন্ট করাতে হবে। ছেলেটির ভারি মিষ্টি চেহারা। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয় সকলেই তাকে পছন্দ করে। কিন্তু শুধু পছন্দ করলে তো চলবে না! তার বাবার অপারেশন করানোর পয়সা নেই। সে খালি কাঁদে আর আমার পায়ে ধরে— 'ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটা যে দিন-দিন নেতিয়ে পড়ছে! ওর অপারেশনটা করে দিন। আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

আচ্ছা মুশকিল! লোকটাকে বোঝানোই যায় না যে, আমার পায়ে ধরলে ওর ছেলে সুস্থ হবে না। ইমিডিয়েটলি সার্জারি করতে হবে। প্রয়োজন মতো হার্টও পাওয়া গেছে। কিন্তু সার্জারির ফি জমা না দিলে অপারেশন হবে কী করে?

সে কথা বলতেই সে ফের কেঁদে ফেলেছে— 'আমি গরিব মানুষ। অত টাকা একসঙ্গে কোথায় পাব? আপনি অপারেশনটা করে দিন। আমি একটু একটু করে সব টাকা শোধ করে দেব।'

আমার মাথা ফের গরম হয়ে যায়। মামারবাড়ির আবদার পেয়েছে! চিকিৎসা করানোর সময় নামকরা ঝাঁ চকচকে নার্সিংহোম! আর টাকা দেওয়ার বেলায় দাতব্য হাসপাতাল! কী ভাবে এরা! এত আধুনিক যন্ত্রপাতি, এত নামীদামি ডাক্তার, এত মেইনটেনেন্স, উন্নত পরিষেবা— এসব কি হাওয়া থেকে আসে!

ভাবছিলাম কেবিন থেকে লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দিই। কিন্তু পারলাম না। সামনের আয়নায় চোখ পড়তেই দেখি, অন্য আমিটা ঠিক আমার পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে! ওর চোখের অন্ধকার কোটর থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল! আমি কী ভাবছি, তা ও জানতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে!

ভয় করছিল... ভীষণ ভয় করছিল! আমি পালাতে চাইছিলাম। ওর কাছ থেকে নিষ্কৃতি চাইছিলাম। একটা মানুষ, যে আমার মতোই দেখতে... যে আমার ভেতরের সমস্ত কথা, সমস্ত অভিসন্ধি জেনে ফেলছে... তাকে সহ্য করা বড্ড কঠিন!

— 'স্যার...'।

যখন ভাবছি ছেলেটার বাবাকে কী বলে বিদেয় দেব, ঠিক তখনই এক জুনিয়র ডাক্তার হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমার ঘরে। তার হাবেভাবে আশঙ্কা।

— 'স্যার, তিনশো চারের পেশেন্ট কোলাপস করছে। প্লিজ ইমিডিয়েটলি আসুন।'

তিনশো চার মানে সেই বাচ্চা ছেলেটা। ওর বাবাও দেখলাম কথাটা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। কথাটার অর্থ সেও বুঝেছে।

মাত্র পনেরো মিনিট সময় দিয়েছিল বাচ্চাটা! ওর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই। খাবি খেতে খেতে একসময় সে নিথর হয়ে গেল। আমি শুধু দেখলাম ওর নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁট! শেষ মুহূর্তে বোধহয় কিছু বলতে চেয়েছিল!...

ওর বাবা তখন পাথর! প্রয়োজনীয় টাকা জমা না দিলে যে সন্তানের লাশটা পাওয়া যাবে না সেটা বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু লোকটা যেন কিছুই বোঝে না! হাবা-কালার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল! তারপর হঠাৎই চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে!

আমি দেখলাম, ওর চোখ দুটো নেই! তার জায়গায় দুটো বীভৎস শূন্য কোটর আমার দিকে তাকিয়ে বীভৎস অট্টহাসি হাসছে। আশপাশের ওয়ার্ডবয়, সিস্টার, ডাক্তাররাও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। কিন্তু... বিশ্বাস করুন... বিশ্বাস করুন... তাদের কারও চোখের মণি ছিল না! সবার চোখে শুধু জমাট অন্ধকার... যেন ওদের চোখ কেউ খুবলে তুলে নিয়েছে!... অবিকল অন্য আমিটার মতো!

আমি পালিয়ে আসি। সেই শূন্য চোখ আমার কাছে বিভীষিকা! সেদিনও খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার গাড়ি কোথায় ছিল কে জানে! চাবিটাও দৌড়োতে গিয়ে পড়ে গেল। গাড়ি ছাড়াই আমি পাগলের মতো রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়োচ্ছি। পালাতেই হবে... পালাতেই হবে ওই বীভৎস চোখের কাছ থেকে।

রাস্তায় তখন অনেক মানুষের ভিড়! আমার চতুর্দিকে ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা অনেকগুলো মুখ ঘুরে বেড়াচ্ছে! ছাতা মাথায় দিয়ে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে জনস্রোত ভেঙে কোন ঠিকানায় দৌড়োচ্ছিলাম কে জানে! অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। ভিজে যাচ্ছিলাম, তবু থামিনি। থামব কেন? আমি অবধারিতভাবেই জানতাম ওই ওয়াটারপ্রুফগুলোর অন্ধকারে বা ছাতার তলায় যে মুখগুলো লুকিয়ে আছে, তার একটারও চোখ নেই! আমি জানতাম... একদম নিশ্চিতভাবে জানতাম!

দৌড়োতে দৌড়োতে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। নিজের বাড়িটাকে দূর থেকে দেখে বড়ো কান্না পেয়ে গেল। ওই তো আমার শান্তির আশ্রয়! ওখানে আমার স্ত্রী আছে... আমার সন্তান আছে...। আমার বেঁচে থাকার অন্যতম কারণ, আমার পরিবার এখানে থাকে! আজ থেকে আর নার্সিংহোম নয়... অন্য কোথাও নয়... পার্টি নয়... পেশেন্ট নয়...। আমি শুধু আমার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব। পিকনিক করব, বেড়াতে যাব, শপিং মলে শপিং করব। বাবাইকে কিনে দেব তার মনমতো খেলনা, অপর্ণাকে পছন্দমতো শাড়ি...!

দরজায় সজোরে নক করি। এই মুহূর্তে ভালোবাসার মানুষদের উষ্ণতা খুব প্রয়োজন। ভালোবাসার কাছে আসতে পারে না অন্ধকার চোখেরা। প্রিয় মানুষদের সান্নিধ্যে তাড়া করে না দুঃস্বপ্নরা। আমি নিরাপদ বোধ করছিলাম... ভীষণ ভীষণ নিরাপদ! আর কেউ

আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না! আর দৌড় করাতে পারবে না!

অনেকক্ষণ ধরে নক করার পর দরজা খুলল বাবাই। আমার একমাত্র সন্তান। সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরে ওর ছোট্ট বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছি। আঃ... কী শান্তি! কী উষ্ণতা!...

— 'বাবা, এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে!' বাবাই প্রশ্ন করল— 'তোমার গাড়ি কোথায়?'

আমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ তুলে ওর দিকে তাকাই। ঠিক তখনই কাছেই প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল! তার নীল আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, বাবাইয়ের চোখদুটো নেই! একদম ফাঁকা! অন্ধকার জানলার মতো...!

ড. তপন মিশ্র বলতে বলতেই বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। ড. সিনহার হাত ধরে বললেন— 'বিশ্বাস করুন ডক্টর, আমি আর পারছিলাম না! আমার জীবনে এমন একটা রহস্য এসে পড়েছে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। যাকে প্রত্যেক মুহূর্তে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছি আমি। কখনও সে আমার নিজের ছায়ায় দেখা দেয়, কখনও অন্যের মধ্যে। কখনও আয়নায় দাঁড়িয়ে হাসে, কখনও নানা রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায়। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম, নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলেছিলাম। একটা অস্বাভাবিক জীবনে কোনওমতে বেঁচে আছি। টের পাচ্ছিলাম একটু একটু করে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছি। হসপিটালে যেতেও ভয় করছিল... ওরা আমার দিকে আবার ওইভাবে তাকাবে...! তাই আজ বিকেলে...।'

ড. সিনহা মন দিয়ে শুনছিলেন— 'আজ বিকেলে কী?'

— 'আজ বিকেলে ঠিক করলাম যে এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। অন্য আমিটাকে মারার একমাত্র উপায়, যদি আমি নিজেই মরে যাই।' ড. মিশ্র মুখ মুছলেন— 'তাই আজ আমি...।'

তার কথনে বাধা দিলেন ড. সিনহা— 'বুঝেছি। আপনার সমস্যা খুব গুরুতর নয়। আসলে এটা হ্যালুসিনেশনের প্রবলেম। চিন্তা করবেন না, সেরে যাবে। শুধু কিছুদিন ট্রিটমেন্ট দরকার।'

টিমটিমে বাতিটার পাশেই একটা বড়ো আলো থাকে। রোগীরা সবসময় অন্ধকার পছন্দ করে বলেই বড়ো আলোটা জ্বালান না তিনি। এবার প্রেসক্রিপশন লেখার জন্য বড়ো আলোটার দরকার পড়ল!

কিন্তু আলোটা জ্বালিয়েই চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর সিনহা!

সব যেখানে থাকার, আছে। দেয়ালে দুটো ছায়া তখনও মুখোমুখি বসে আছে! তপন মিশ্রের ধরানো সিগারেটটা তখনও জ্বলছে!

কিন্তু... শূন্যে!

আর কেউ নেই!

ড. সিনহা অজ্ঞান হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে শুনতে পেলেন, কে যেন ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে বলল— 'ডক্টর... আমি কি বেঁচে আছি?'